

নারীর অধিকার ও মর্যাদা

বর্তমান বাস্তবতা : আমাদের করণীয়



নারীর অধিকার ও মর্যাদা

বর্তমান বাস্তবতা : আমাদের করণীয়



হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক, ইনসাফ ফাউন্ডেশন
শাইখুল হাদীস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

আত্মপ্রকাশমূলক সেমিনারে পঠিত
স্থান : কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়াম (KIB HALL) খামারবাড়ি, ফার্মগেট
সময় : ২৩ আগস্ট, শনিবার সকাল ১০:০০ - ১২:৩০

INSAF
FOUNDATION
Initiative for Nobility Safety & Awareness of Female

নারীর অধিকার ও মর্যাদা
বর্তমান বাস্তবতা : আমাদের করণীয়

প্রথম প্রকাশ
সফর ১৪৪৭ হিজরী
আগস্ট ২০২৫ ঈসায়ী

© স্বত্ব সংরক্ষিত

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দাওয়াহর উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ বইয়ের নাম উল্লেখপূর্বক কোনো প্রকার বিকৃতিসাধন ব্যতিরেকে উদ্ধৃত করার অনুমতি রয়েছে।

Women's Dignity : Contemporary Realities, Challenges, And Our Role By Maulana Abul Bashar Muhammad Saiful Islam, Published By Insaf Foundation.

INSAF
FOUNDATION
Initiative for Nobility Safety & Awareness of Female

প্রকাশক
ইনসাফ ফাউন্ডেশন
: +8801339-467186
: +8801901-635081
বাড়ী-৫, রোড-১২, সেক্টর-১০
উত্তরা, ঢাকা

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :

পৃথিবীতে মানবতার সূচনা এক পরিপূর্ণ পুরুষ ও পরিপূর্ণ নারী হযরত আদম ও হযরত হাওয়া আলাইহিমাস সালামের দ্বারা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِه وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

> হে লোক সকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার অছিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে (নিজেদের হক) চেয়ে থাক। এবং আত্মীয়দের (অধিকার খর্ব করা)কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।[১]

এটি অত্যন্ত সারগর্ভ ও পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক আয়াত। এর ভেতর কেবল মানবসৃষ্টির সূচনাই নয়; পৃথিবীতে নর-নারীর দায়িত্ব-কর্তব্য, পারস্পরিক মূল্যায়ন, সহযোগিতামূলক মনোভাব, কর্মবন্টন ও সশ্রদ্ধ অংশীদারত্বমূলক সহাবস্থানের পথ দেখানো হয়েছে, যা কিনা আদর্শ পরিবার ও মানবিক সমাজ গঠনের সরল-সঠিক পথ। এ আয়াতটি মূলত

[১] সূরা নিসা, আয়াত ০১

একটি ভূমিকাস্বরূপ। পরবর্তী আয়াতসমূহে রয়েছে এর ব্যাখ্যা। আরও ব্যাপক পরিসরে এর ব্যাখ্যা রয়েছে কুরআন মাজীদের আরও বিভিন্ন সূরায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু হাদীছে।

কুরআন ও হাদীছে নর-নারীর কল্যাণময় সম্পর্ক, সুখী দাম্পত্য ও আদর্শ সমাজ গঠনের যে রূপরেখা দেওয়া হয়েছে, ইসলামের সোনালী যুগসমূহে তার বাস্তব প্রতিফলনও ঘটেছিল। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেন– আল্লাহর কসম! আমরা জাহিলিয়্যাতের যুগে নারীদের কোনও গুরুত্বই দিতাম না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁদের সম্পর্কে যা অবতীর্ণ করার ছিল তা অবতীর্ণ করলেন, এবং তাঁদের জন্য যা ভাগ নির্ধারণ করার ছিল তা নির্ধারণ করলেন।[২]

ইসলামী ইতিহাসের গ্রন্থরাজিতে তখনকার পরিবার ও সমাজের যে চিত্র দেখতে পাই, তাতে নারীদের নিরাপদ ও সম্মানজনক অবস্থান সুস্পষ্ট। সেখানে মায়েরা সন্তানদের আদর্শিক প্রতিপালন করছে, স্ত্রীরা স্বামীদের দীনী ও দুনিয়াবী দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সহযোগিতামূলক ভূমিকা রাখছে। যোগাচ্ছে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা। তারা এসব পেরেছে এ কারণে যে, তখন তাদের জানমালের নিরাপত্তা ছিল। তাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম সুরক্ষিত ছিল। তখন পুরুষগণ এসব বিষয়ে পরিপূর্ণ সচেতন ছিল। তারা নারীর মূল্য বুঝত। নারীর হুকূক সম্পর্কে তাদের জানাশোনা ছিল। সে জানাশোনার ভিত্তিতে তারা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করত। সর্বোপরি তখন তাকওয়ার ব্যাপক চর্চা ছিল। মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি ছিল। ছিল আখেরাতের জবাবদিহিতার ভয়।

কিন্তু এখনকার সমাজ-বাস্তবতা কী? চারদিকে আমরা কী দেখছি? মানুষ একে অন্যের হক আদায়ে সচেতন নয়– না পুরুষ, না নারী। তারা একে অন্যের হক জানে না। বুঝতে চেষ্টা করে না। নেই সহীহ দৃষ্টিভঙ্গি ও আল্লাহভীতির চর্চা। ফলে সর্বত্র হক আত্মসাতের মচ্ছব। একে অন্যকে ঠকানোর চেষ্টা করছে। একে অন্যের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। জুলুম-নিপীড়ন সর্বব্যাপী। মানসিক নিপীড়ন তো উভয় দিক থেকেই চলছে। বলা যায় সমানে সমান। একে অন্যের মর্যাদা সম্পর্কে

[২] সহীহ বুখারী : ৪৯১৩

বেপরোয়া। পারস্পরিক আচরণ সম্মানজনক নয়। নেই গুণগ্রাহিতার চর্চা। তা চর্চার মানসিকতাও হারিয়ে গেছে। সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতির মূল্যায়ন ও পারস্পরিক মননশীলতার চর্চা দুর্লভ সম্পদে পরিণত হয়েছে। তা দুর্লভ হবেই বা না কেন, যখন জানমালের মতো স্থূল বিষয় পর্যন্ত আমরা স্বাভাবিক মানবিকতা হারাতে বসেছি। আজকের সমাজে বাবা কর্তৃক মেয়েকে আর্থিকভাবে বঞ্চিত করার ঘটনা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। যেই মা নিজ উদরে বহন করেছেন, বুকের অমৃত পান করিয়ে নির্ঘুম প্রতিপালন করেছেন, তিনিও পর্যন্ত সম্পত্তির বেলায় পুত্রঘেষা। আর বোনের ন্যায্য অধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার বেলায় তার প্রিয় সহোদরদের আমরা কেমন জায়গায় দেখছি?

রইল শারীরিক সহিংসতার কথা। আজ এটা এক লোমহর্ষক বাস্তবতা। চড়-থাপ্পর মারা থেকে শুরু করে পিটিয়ে জখম করা, হাত-পা ভেঙ্গে দেওয়া, আগুনের ছ্যাঁকা দেওয়া এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা– এ সবই নিত্যদিনকার ঘটনা। আজকের স্বামীরা স্ত্রীদের জন্য কতটুকু আস্থা ও নির্ভরতার জায়গায় অবস্থান করছে? ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এই বহুমাত্রিক সহিংসতা তো একান্তই নিজেদের লোকজন দ্বারা ঘটছে। এর বাইরে আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে পাশববৃত্তিতাড়িত লোকজন দ্বারা যে সহিংসতার উন্মত্ত উচ্ছ্বাস, তার ক্রমবৃদ্ধি তো আছেই। আছে অবৈধ সম্পর্কজনিত সহিংসতার বিচিত্র ধরণ। তাছাড়া পথেঘাটে, অফিসে-আদালতে, যানবাহনে, দোকানপাটে নীতিভ্রষ্টতা ও হয়রানির হরেক প্রকাশ।

এসব বিষয় আমাদের সকলেরই জানা। এ অঙ্গনে কাজও করছেন অনেকে। তবে তা করছেন ব্যক্তিগতভাবে। সমন্বিত বা সম্মিলিত উদ্যোগ নেই। ব্যক্তিগত চেষ্টার প্রয়োজন অনস্বীকার্য নিশ্চয়ই। কিন্তু তা যে যথেষ্ট নয়, অভিজ্ঞজনেরা তা অবশ্যই স্বীকার করবেন। এমন অজস্র ঘটনা আছে, যেখানে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সম্মিলিত শক্তির অভাবে বিশেষ সুফল

বয়ে আনতে পারেনি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা ব্যর্থও হয়েছে। আবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা না থাকায় অনেকের কাছে এসব সহিংসতা গা-সওয়া হয়ে গেছে।

অপরদিকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা প্রচার না পাওয়ায় অজ্ঞজন বা দুর্জনেরা মহান ইসলামের উপর এর দায় চাপানোর সুযোগ পাচ্ছে। অথচ মহান ও পূর্ণাঙ্গ দীন ইসলামই সর্বপ্রথম নারী-পুরষ নির্বিশেষে সকলেরই জন্য যথাযথ মর্যাদা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা দান করেছে। সে ব্যবস্থা কার্যকর করার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ থাকলে পরিস্থিতি আজকের মতো এমন বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছাত না। কিন্তু আমরা বড় দেরি করে ফেলেছি। বিলম্বজনিত সে অপরাধের দায় মোচনের জন্য আমাদের দরকার সত্যিকারের তাওবা। সে তাওবার স্থান থেকেই বিগত ভুলের অনুশোচনায় আমরা কর্তব্য পালনের অঙ্গীকার গ্রহণের অনুপ্রেরণা পেয়েছি।

ইনসাফ ফাউণ্ডেশন সে অনুপ্রেরণারই মুকুল। এ মুকুল একদিন ফুল হয়ে ফুটবে, ফল ও ফসলে পরিপূর্ণতা লাভ করবে– সে আশায় এ প্রতিষ্ঠানের পদযাত্রা। তাওয়াক্কুল উদ্দীপিত দৃঢ় এ পদযাত্রায় আমরা আপনাদের সহযোগ কামনা করছি।



সূচিপত্র

নারী-পুরুষের সাধারণ অধিকার - ১১

প্রাণের সুরক্ষা ১২

আত্মহত্যার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ১৩

সম্পদ বা মালের অধিকার ১৬

দেনমোহর ১৯

ইজ্জত-সম্মানের অধিকার ২১

নিজ পরিবারের সম্মান রক্ষা ২৪

অন্যের সম্মান রক্ষা করা ২৫

নারীর বিশেষ অধিকার ২৮

নারী নির্যাতন - ৩০

পশ্চিমা বিশ্বে নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্র ৩১

শারীরিক নির্যাতন ৩৪

যৌন নির্যাতন ৩৮

বিবাহকে উৎসাহিত করা ৪৪

ব্যভিচারের শাস্তি ৪৬

মানসিক নির্যাতন ৪৯

পুরুষের قوامة বা অভিভাবকত্ব-এর অর্থ ৫০
নারীর প্রতি অযত্ন-অবহেলা ৫১
ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল ৫৩
মানসিক নির্যাতনের ক্ষতি ৫৪
তালাকের বিধান : বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিকতা ৫৫
পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন ৬০
কন্যা সন্তান ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ৬২
নারীশিক্ষা ৬৫
অর্থনৈতিক নির্যাতন ৬৮
নারীকে উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা ৬৮
যৌতুকের জন্য চাপ দেওয়া ৭০
মোহর বঞ্চিত করা ৭১
নারীর মর্যাদা - ৭২
নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও নারীনির্যাতন রোধে আমাদের করণীয় ৭৭
সমাজের দায়িত্ব ৭৯

নারী-পুরুষের সাধারণ অধিকার

মানুষমাত্রই আল্লাহ তা'আলার মর্যাদাবান সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা যেমন তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তেমনি অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণও সরবরাহ করেছেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য মাখলুকের সাথে তার পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য হিসেবে দিয়েছেন সম্মান ও মর্যাদার অমূল্য সম্পদ। সুতরাং মানুষের মৌলিক সম্পদ তিনটি। তার অস্তিত্ব, তার মাল ও তার ইজ্জত-সম্মান। এ তিনটি নর-নারীর সাধারণ হক বা অধিকার। এ অধিকারে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। পুরুষের যেমন বাঁচার অধিকার আছে, তেমনি বাঁচার অধিকার আছে নারীরও। পুরুষের যেমন সম্পদের মালিকানা লাভের অধিকার আছে, তেমনি এ অধিকার আছে নারীরও। একই কথা ইজ্জত-সম্মানের ক্ষেত্রেও। নারী-পুরুষ উভয়েরই আছে সম্মানজনক বাঁচার অধিকার।

বাঁচার বা আত্মরক্ষার অধিকার কথাটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। মানুষ দেহ ও প্রাণের সমষ্টির নাম। দেহ তার প্রাণের ধারক। দেহ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কাজেই বাঁচার অধিকার বলতে তার গোটা দেহ ও সম্পূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচার অধিকার বোঝায়। তার হাত, তার পা, তার চোখ-কান তথা প্রতিটি অঙ্গে তার একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে। তার কোনও অঙ্গে কারও অন্যায় হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার দ্বারা যেমন তার জানের হক নষ্ট করা হয়, তেমনি তার অঙ্গের বিনাশ বা তার যে কোনও অঙ্গে আঘাত করার দ্বারাও তার জানের অধিকার খর্ব করা হয়। সুতরাং হত্যা করার মতোই কাউকে অন্যায়ভাবে মারপিট করাও জানের অধিকার লঙ্ঘন জাতীয় অপরাধ।

প্রাণের সুরক্ষা

মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা বা বেঁচে থাকার অধিকার সম্পূর্ণই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রদত্ত এক মৌলিক অধিকার। এ অধিকারের রয়েছে দুটি দিক।

ক. এক তো হলো আত্মরক্ষার বিষয়টা মানুষের মৌলিক অধিকার।

খ. আর এ অধিকার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ প্রদত্ত। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মালিক। ইরশাদ হয়েছে–

وَ لَه مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারাই আছে, সকলেই আল্লাহর।[১]

আরও ইরশাদ হয়েছে–

وَ لَه مَا سَكَنَ فِی الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

রাত ও দিনে যত সৃষ্টি বিশ্রাম গ্রহণ করে, সব তারই অধিকারভুক্ত। তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।[২]

মালিক তার মালিকানাধীন মাখলুকের সুরক্ষার প্রয়োজনে একদিকে আইন জারি করেছেন যে, মানুষ যেন একে অন্যের অস্তিত্বের জন্য হুমকি না হয়। কেউ যেন কারও উপর অন্যায় আঘাত না করে। তা করলে অন্যের বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করা হবে। এ অধিকার হরণ কঠিন পাপ।

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِی الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا

কেউ যদি কাউকে হত্যা করে এবং তা অন্য কাউকে হত্যা করার কারণে কিংবা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তারের কারণে না হয়, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল।[৩]

---

[১] সূরা আম্বিয়া : ১৯

[২] সূরা আনআম : ১৩

[৩] সূরা মায়েদা : ৩২

وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُه جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَه وَ اَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيْمًا

যে ব্যক্তি কোনও মুসলিমকে জেনেশুনে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি গজব নাযিল করবেন ও তাকে লানত করবেন। আর আল্লাহ তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।[৪]

আত্মহত্যার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

অন্যদিকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এই বিধানও আরোপ করেছেন যে, প্রত্যেকে যেন নিজ প্রাণ রক্ষায় সচেতন থাকে। কেউ আত্মহত্যা করবে না। নিজে নিজ অঙ্গহানিও করবে না। অন্যকেও তার প্রাণনাশ বা অঙ্গহানির সুযোগ দেবে না। এমনকিছু করলে আল্লাহর মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা হবে। তাঁর হক নষ্ট করা হবে। সুতরাং ইসলামে যেমন অন্যকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বা অন্যায়ভাবে অন্যের অঙ্গহানি করা নাজায়েয, তেমনি নিজেও নিজেকে হত্যা করা বা স্বেচ্ছায় নিজের কোনও অঙ্গহানি করাও সম্পূর্ণ নাজায়েয। আল্লাহ তা'আলার হুকুম–

لَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ

তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না।[৫]

আরও ইরশাদ–

لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।[৬]

সুতরাং আত্মহত্যা করা সম্পূর্ণ নাজায়েয কাজ। যে ব্যক্তি কোনওভাবে নিজে নিজের প্রাণনাশ করে, সে কঠিন পাপী। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

[৪] সূরা নিসা : ৯৩
[৫] সূরা নিসা : ২৯
[৬] সূরা বাকারা : ১৯৫

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, সেখানে অনন্তকাল নিক্ষিপ্ত হতেই থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে অনন্তকাল বিষপান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি কোনও ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে অনন্তকাল সেই অস্ত্র দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।[৭]

এ সতর্কবাণী তো সরাসরি আত্মহত্যার বেলায়। কেউ যদি আত্মহত্যা করে পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ অবহেলাবশত এমন কোনও কাজ করে, যা তার প্রাণনাশের কারণ হয়, তাও কঠিন অপরাধ। সুতরাং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ

যে ব্যক্তি এমন কোনও ছাদে রাত যাপন করে, যার চারপাশে বেষ্টনী নেই, তার থেকে আল্লাহর যিম্মাদারী উঠে যায়।[৮]

বোঝা গেল, আত্মরক্ষায় সচেতন থাকা জরুরি। নিজ প্রাণের উপর ঝুঁকি আসে, অহেতুক এমন কোনও কাজ করা ইসলামসম্মত নয়। অস্তিত্ব যেহেতু আল্লাহর দান, তাই আল্লাহর হক হিসেবেই এর সুরক্ষা জরুরি। কাজেই অন্য কারও পক্ষ থেকে প্রাণনাশের হুমকি আসলে তা প্রতিহত করাও জরুরি হয়ে যায়। তা করতে গিয়ে মৃত্যু ঘটলে সে মৃত্যু সম্মানজনক। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

[৭] সহীহ বুখারী : ২৭৭৮; সহীহ মুসলিম : ১০৯

[৮] সুনানে আবু দাউদ : ৫০৪১; আল-আদাবুল মুফরাদ : ১১৯২

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

যে ব্যক্তি নিজ সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজ দীন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজ প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজ পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ।[৯]



[৯] সুনানে তিরমিযী : ১৪২১; সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৭২

সম্পদ বা মালের অধিকার

প্রত্যেকেরই সম্পদ অর্জন করা, সম্পদের মালিকানা লাভ করা এবং স্বাধীনভাবে সে সম্পদ খরচ করার অধিকার আছে। নারী-পুরুষ হিসেবে এ অধিকারে কোনও পার্থক্য নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِه اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا

পুরুষ যা অর্জন করে তাতে তার অংশ থাকবে এবং নারী যা অর্জন করে তাতে তার অংশ থাকবে। আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।[১০]

উপার্জন করা মালিকানা লাভের একটি সূত্র। এ আয়াত উভয়কেই এ সূত্রে সম্পদ অর্জনের অধিকার দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজা রাযি. নিজে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যবসার অংশীদারও বানিয়েছিলেন। আনসারী নারী সাহাবী হযরত উম্মে মুবাশশির রাযি.-এর খেজুর বাগান ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে প্রবেশ করে এ জাতীয় কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধও করেছেন। (সহীহ মুসলিম : ১৫৫২) হযরত জাবির রাযি.-এর খালা সম্পর্কেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। (সহীহ মুসলিম : ১৪৮৩)

সম্পদ অর্জনের এ ছাড়া আরও যত সূত্র আছে, তাতেও ইসলাম নারীকেও পুরুষের মতোই অধিকার দান করেছে। যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

[১০] সূরা নিসা : ৩২

> পুরুষদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায় আর নারীদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায়, চাই সে (পরিত্যক্ত) সম্পদ কম হোক বা বেশি। এ অংশ (আল্লাহর তরফ থেকে) নির্ধারিত।[১১]

উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েরই অধিকার সাব্যস্ত করে এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

> إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
>
> আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক অধিকারীকে তার হক দিয়েছেন। তাই কোনও উত্তরাধিকারীর জন্য অতিরিক্ত অসিয়ত নেই।[১২]

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, উত্তরাধিকার সম্পদে আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ প্রত্যেকের হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং কেউ তা বাড়াতে বা কমাতে পারবে না।

এছাড়া সম্পদলাভের আরও যত সূত্র আছে, যেমন হেবা বা উপহার, সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের মতো নারীকেও ইসলাম অধিকার দান করেছে। নারীকে তার নিজস্ব সম্পদ হিসেবে হেবা করা সম্পূর্ণ বৈধ। ইসলামি বিধি মোতাবেক নারীর এ সকল উপার্জন বৈধ এবং তাতে তার পূর্ণাঙ্গ মালিকানা প্রতিষ্ঠা পাবে।

সম্পদের অধিকার কথাটির অর্থই হচ্ছে সম্পদের মালিকানা লাভ এবং ভোগ-দখলের অধিকার। বিশুদ্ধ সূত্রে মালিকানা লাভ করলে তাতে ব্যক্তির নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সে শরিয়তসম্মতভাবে তা পূর্ণ ভোগ-দখলের অধিকার রাখে। নিজেও ব্যবহার করতে পারে, অন্যকেও দান-খয়রাত করতে পারে। সুতরাং কারও মালিকানাভুক্ত সম্পদ তার অসম্মতিতে ভোগ-দখল করলে তাতে একান্তই তার অধিকার হরণ করা হয়, যা কঠিন অপরাধ। এ মর্মে কুরআন ও হাদীছে বহু নির্দেশনা

---

[১১] সূরা নিসা : ০৭

[১২] সুনানে আবু দাউদ : ২৮৭০

এসেছে। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে কোনও ব্যবসায় করা হলে (তা জায়েয)।[১৩]

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ.

কোনও মুসলিমের সম্পদ তার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যের জন্য হালাল নয়।[১৪]

অপর এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

যে অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমিও দখল করে, কেয়ামতের দিন সপ্তস্তর ভূমিসহ তা তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।[১৫]

মোটকথা, যে সম্পদ কোনও ব্যক্তির নিজের নয়, সে যদি অন্যায় পন্থায় তা নিজ ভোগ-দখলে নেয়, তবে সে অন্যের অধিকার হরণকারী হিসেবে এক কঠিন পাপী সাব্যস্ত হবে। সে অন্যায় পন্থার মধ্যে রয়েছে চুরি করা, সুদ ও ঘুষ খাওয়া, ওজনে কম দেওয়া, মালে ভেজাল মেশানো, জবরদখল করা, জাল দলিল ও মিথ্যা শপথের মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত করা, উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি।

অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা যেমন নাজায়েয কাজ, তেমনি নিজে নিজ সম্পদ অবহেলাভরে নষ্ট করাও শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ।

---

[১৩] সূরা নিসা : ২৯

[১৪] সুনানে দারাকুতনী : ২৮৮৬

[১৫] সহীহ মুসলিম : ১৩৮

সুতরাং ইসলাম অপচয় ও অপব্যয় করাকে শয়তানি কর্ম ও নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা সাব্যস্ত করেছে। ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۭ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

জেনে রেখো, যারা অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ উড়ায়, তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান নিজ আর শয়তান নিজ প্রতিপালকের ঘোর অকৃতজ্ঞ।[১৬]

সারকথা, নিজ সম্পদের হেফাজত করা জরুরি। এর দ্বারা বোঝা যায়, কেউ কারও সম্পদ আত্মসাৎ করতে চাইলে সাধ্যমতো তা প্রতিহত করা কর্তব্য। বরং ইসলাম তা প্রতিহত করতে উৎসাহ দান করেছে। কেউ তা করতে গিয়ে যদি মারা যায়, সে মৃত্যুকে শহীদী মৃত্যু সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

যে ব্যক্তি নিজ সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ।[১৭]

দেনমোহর

নারীর সম্পদ উপার্জনের একটি বিশেষ সূত্র হলো মোহর লাভ। মোহর দেওয়া বিবাহের বৈধতার জন্য শর্ত। মোহর নারীসত্ত্বার বিক্রিমূল্য নয়; বরং এটা বিবাহে নারীর প্রতি পুরুষের সম্মাননা। মোহরের অর্থ সম্পূর্ণই স্ত্রীর হক। এটা আদায় করা ফরজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاٰتُوا النِّسَاۗءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۭ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۗـــًٔا مَّرِيْۗـــًٔا

তোমরা নারীদেরকে খুশিমনে তাদের মোহর আদায় করো। তারা নিজেরা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা সানন্দে, স্বচ্ছন্দভাবে ভোগ করতে পার।[১৮]

---

[১৬] সূরা বনী ইসরাঈল : ২৭

[১৭] সুনানে তিরমিযী : ১৪২১; সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৭২

[১৮] সূরা নিসা : ০৪

আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে– মোহর কোনও অনুগ্রহ নয়; বরং এটি স্ত্রীর প্রাপ্য এবং এর সম্পূর্ণ মালিকানা তার। সে তার ইচ্ছামতো তা ব্যবহার করার অধিকার রাখে। তাতে তার স্বামী বা অভিভাবকের আপত্তি করার কোনও এখতিয়ার থাকে না।



ইজ্জত-সম্মানের অধিকার

ইসলামে মানুষের ইজ্জত-সম্মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়েছেন। বলেছেন–

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

> বাস্তবিকপক্ষে আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও জলে তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমার বহু মাখলুকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।[১৯]

আয়াতে বলা হয়েছে বনী আদমের কথা। অর্থাৎ হযরত আদম আ. থেকে উদ্ভুত সকল মানুষ, যার মধ্যে নারী পুরুষ উভয়েই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এখানে পুরো মানবজাতিকে মর্যাদাদানের কথা বলেছেন। মর্যাদাবান হওয়া মানুষের আল্লাহ প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য। এরই কারণে অন্যান্য মাখলুক থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। তাই এ মর্যাদা মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের অধিকার। এটা রক্ষা করা তার কর্তব্য। এতে অন্যায় হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। কারও মর্যাদাহানি করা ইসলামে কঠিন অপরাধ বলে বিবেচিত। এ সম্পর্কে রয়েছে বহু সুস্পষ্ট নির্দেশনা। যেমন এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ.

> প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের উপর হারাম– তথা তার জান, মাল ও ইজ্জত-সম্মান।[২০]

---

[১৯] সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০

[২০] সহিহ মুসলিম : ২৫৬৪

এ হাদীছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলিমের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণের বিধান দেওয়া হয়েছে।

ইজ্জত-সম্মান হলো মানুষের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থানের প্রতীক। ইসলাম এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ভেদাভেদ করেনি। বরং নারীর ইজ্জত-সম্মানের নিরাপত্তা ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলোর একটি। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে স্বতন্ত্র বাণী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

> স্মরণ রেখো, যারা চরিত্রবতী, সরলমতী মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত হয়েছে আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি।[২১]

মানুষের ইজ্জত-সম্মানের এ অধিকার সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলারও ভিত্তি। কেননা মানুষের প্রকৃতিই হলো সে সম্মান ও মর্যাদা কামনা করে। সম্মান নিয়ে বাঁচতে চায়। এভাবেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক মানুষের কাছেই ইজ্জত অনেক গুরুত্বপূর্ণ। দুই ব্যক্তি যখন একে অন্যকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে, তখন তাদের মধ্যকার সম্পর্কে মসৃণতা আসে। এতে পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালোবাসা জন্ম নেয়। সম্মানহানির কারণে ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট হয়, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, যা সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা উধাও করে দেয়।

সম্মানহানি নানাভাবেই হতে পারে। যেমন গালাগাল করা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, অবজ্ঞা করা, কুৎসা রটানো, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, গোপন কথা ফাঁস করা ইত্যাদি। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ

> হে মুমিনগণ! তোমাদের একদল যেন অপর দলকে উপহাস না করে।[২২]

---

[২১] সূরা নূর : ২৩

[২২] সূরা হুজুরাত : ১১

আরও বলা হয়েছে–

وَ لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ

তোমরা একে অন্যকে দোষারোপ করো না এবং একে অন্যকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না।[২৩]

আরও ইরশাদ–

وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا

তোমরা কারও গোপন ত্রুটির অনুসন্ধানে পড়বে না এবং তোমাদের একে অন্যের গীবত করবে না।[২৪]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، ...بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ.

মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করবে না, তাকে লাঞ্ছিত করবে না, তাকে হেয় করবে না ... কোনও মুসলিমের মন্দত্বের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে হেয় করবে। এক মুসলিমের সবকিছুই অপর মুসলিমের জন্য হারাম, তথা তার প্রাণ, তার সম্পদ ও তার ইজ্জত।[২৫]

আরও ইরশাদ করেন–

إِنَّ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ: عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَنَفْسُهُ.

জেনে রেখো, এক মুমিনের সবকিছুই অপর মুমিনের জন্য হারাম– তার ইজ্জত, তার মাল ও তার প্রাণ।[২৬]

---

[২৩] প্রাগুক্ত

[২৪] সূরা হুজুরাত : ১২

[২৫] সহীহ মুসলিম : ২৫৬৪

[২৬] মুসনাদে আহমাদ : ১৭৫৩৫

মোটকথা, অন্যের উজ্জত-সম্মানে আঘাত লাগে এমন কোনও আচরণ ও কথাবার্তা জায়েয নয়।

ইজ্জত-সম্মান যেহেতু আল্লাহপ্রদত্ত হক, তাই অন্যের এ হক নষ্ট করা যেমন কোনও বৈধতা নেই, তেমনি নিজে নিজের ইজ্জত-সম্মান নষ্ট করাও সম্পূর্ণ নাজায়েয। প্রত্যেকের কর্তব্য আত্মসম্মান রক্ষায় যত্নবান থাকা। কাজেই অন্যের দ্বারা কারও এ হক ভূলুণ্ঠিত হওয়ার উপক্রম হলে সর্বপ্রকারে তা প্রতিহত করা জরুরি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীছে ইরশাদ করেন–

لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ.

কোনও মুমিনের নিজেকে লাঞ্ছনায় ফেলা উচিৎ নয়।[২৭]

অপর এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

مَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً.

মানুষ যা দ্বারা নিজ সম্মান রক্ষা করে তা তার জন্য সদাকা।[২৮]

সুতরাং নিজ সম্মান রক্ষায় যথাসাধ্য চেষ্টা করা অবশ্যকর্তব্য। প্রতিহত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি অন্যকে তার সম্ভ্রমহানি করতে দেয়, তবে সে কেবল নিজের হকই নষ্ট করবে না; আল্লাহ তা'আলার হকও নষ্ট করবে। তাই অন্যকে সম্ভ্রমহানি করতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া মোটেই জায়েয নয়। প্রয়োজনে শক্তি আরোপ করবে। এমনকি মৃত্যু নিশ্চিত জানলেও। কেননা সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে মারা পড়লে তা হবে শহীদী মৃত্যু।

নিজ পরিবারের সম্মান রক্ষা

নিজ সম্মান রক্ষা করা যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি নিজ পরিবারের সম্মান রক্ষা করাও। কেননা কোনও ব্যক্তি তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নরূপে

[২৭] জামে' তিরমিযী : ২২৫৪
[২৮] সুনানে দারাকুতনী : ২৮৯৫

বিচার্য হয় না। পরিবার ব্যক্তিসত্তারই অংশবিশেষ। কারও পরিবারের সম্মান ভুলুণ্ঠিত হবে আর তার নিজ সম্মান সুরক্ষিত থাকবে এটা হতে পারে না। পরিবারের সম্মান তার নিজেরই সম্মান। কাজেই নিজ সম্মানের মতো পরিবারের সম্মান রক্ষা করার জন্য সর্বপ্রকারে সচেষ্ট থাকা একান্ত কর্তব্য। অন্যের দ্বারা পরিবারের সম্মানহানি ঘটলে তা অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে। এমনকি সেজন্য যদি প্রাণও দিতে হয়। ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

যে ব্যক্তি নিজ পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ।[২৯]

অন্যের সম্মান রক্ষা করা

নিজ পরিবারের মতো অন্য মুসলিম নারীদেরও সম্ভ্রম রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব। কেউ যদি অপর কোনও মুসলিমের সম্ভ্রমহানি হতে দেখে, কিংবা কারও সম্ভ্রমহানি হচ্ছে বলে জানতে পারে, তবে তা প্রতিহত করা তার জন্য অবশ্যকর্তব্য। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীছে ইরশাদ করেন–

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় কাজ দেখে, সে যেন তা হাতে প্রতিহত করে। হাতে না পারলে মুখে আর মুখে না পারলে অন্তরে। আর এটা ঈমানের দুর্বলতম স্তর।[৩০]

অপর এক হাদীছে ইরশাদ–

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ

[২৯] সুনানে তিরমিযী : ১৪২১; সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৭২
[৩০] সহীহ মুসলিম : ৪৯

مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ»

তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে মাযলুম হলেও, যালেম হলেও। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ, মাযলুম অবস্থায় সাহায্য করা তো ঠিক আছে, কিন্তু যালেম অবস্থায় কিভাবে সাহায্য করব? বললেন– তার হাত ধরে (থামিয়ে)।[৩১]

সারকথা, নিজ সম্মানের মতোই যে কোনও মুসলিম ভাই-বোনের সম্মান রক্ষায় ভূমিকা রাখা একান্ত কর্তব্য। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা করবে না, সে কঠিন পাপী সাব্যস্ত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীছে ইরশাদ করেন–

مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

যার সামনে কোনও মুমিনকে অপদস্ত করা হয়, আর সে সক্ষমতা সত্ত্বেও তাকে সাহায্য না করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কেয়ামতের দিন সকলের সামনে লাঞ্ছিত করবেন।[৩২]

অপর এক হাদীছে বলা হয়েছে–

مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا عِنْدَ مَوْطِنٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ.

যে কেউ কোনও মুসলিম ব্যক্তিকে এমন স্থানে অসহায় ছেড়ে দেয়, যেখানে তাকে লাঞ্ছিত করা হয় ও সম্মানহানি করা হয়,

[৩১] সহীহ বুখারী : ২৪৪৪

[৩২] মুসনাদে আহমাদ : ১৫৯৮৫

> আল্লাহ তাকে এমন জায়গায় লাঞ্ছিত করবেন, যেখানে সে তাঁর সাহায্য কামনা করবে। আর যে কেউ কোনও মুসলিম ব্যক্তিকে এমন স্থানে সাহায্য করে, যেখানে তাকে লাঞ্ছিত করা হয় ও সম্মানহানি করা হয়, আল্লাহ তাকে এমন জায়গায় সাহায্য করবেন, যেখানে সে তাঁর সাহায্য কামনা করবে।[৩৩]

প্রকাশ থাকে যে, কারও সাহায্য করার বেলায় এটা লক্ষণীয় নয়– সে দীনদার না পাপী। কোনও নারী দীনদার না হলেও যদি কোথাও তার সম্ভ্রমহানি হতে দেখা যায়, তবে অবশ্যই তার সাহায্য করতে হবে। এটা নারীমাত্রেরই অধিকার। কোনও নারী যদি অপরিচিতও হয়, তবে সেও এ অধিকারের বাইরে নয়। কোনও মুসলিম রাষ্ট্রে কেউ অমুসলিম নাগরিকের উপর অন্যায় আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করা মুসলিম সাধারণেরই কর্তব্য। এছাড়া যে কোনও স্তরে জুলুম হতে দেখলে তা প্রতিহত করা চাই। পিতাও যদি সন্তানের উপর অন্যায় আক্রমণ করে কিংবা শিক্ষক তার ছাত্রের প্রতি, কর্মকর্তা তার অধীন কর্মচারীদের প্রতি, মালিক তার শ্রমিকদের প্রতি, অনুরূপ যে কোনও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক পক্ষ জুলুমের শিকার হলে তার পক্ষে দাঁড়ানো ঈমানী দায়িত্ব। শর্ত একটাই– প্রতিহত করার সামর্থ্য থাকা। প্রতিহত করতে গিয়ে নিজ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তখনকার কথা ভিন্ন।

আরও উল্লেখ্য, জান-মাল-ইজ্জত যে কোনও দিক থেকেই যদি কেউ জুলুমের শিকার হয়, তবে নিজে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখলে তো সাহায্য করবে, অন্যথায় যারা সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে তাদের শরণাপন্ন হবে। এর দ্বারাও দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। মোটকথা যে কোনও উপায়ে মাজলুমের সাহায্য নিশ্চিত করা চাই।

---

[৩৩] মুসনাদে আহমাদ : ১৬৩৬৮

নারীর বিশেষ অধিকার

পেছনে তো নারী-পুরুষের সাধারণ অধিকার সম্পর্কে আলোচনা হলো। এবার নারীর কিছু বিশেষ অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা যাচ্ছে। তার মধ্যে একটা হলো ঘরে থাকার অধিকার।

মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনা এমন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, এখানে প্রত্যেকে কোনও না কোনও ভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল। (ঠিক কোনও যন্ত্রের পার্টসের মতো। সবগুলো পার্টস মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ যন্ত্রের আকার ধারণ করে। কোনও একটি পার্ট অকর্মণ্য নয়। কোনও পার্টকেই অবহেলা করা যায় না।) প্রত্যেকেই কোনও না কোনও দিক থেকে অসম্পূর্ণ। একদিক আছে তো অন্যদিক নেই। তাই পারস্পরিক সহযোগিতা দরকার। মৌলিকভাবে মানুষ তো দুই শ্রেণির– নারী ও পুরুষ। মানবসমাজের জন্য প্রত্যেক শ্রেণির ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। তাই পরস্পরে মূল্যায়ন দরকার।

নারী ও পুরুষ দুজনেই মানুষ, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতিগতভাবে দু'জনকেই আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন। তাতে কারও জন্য কোনও হীনতা নেই। নারী যেমন কিছু ক্ষেত্রে পারদর্শী এবং কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, পুরুষও ঠিক সেরকমই; কোনও কোনও ক্ষেত্রে পারদর্শী এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রত্যেকের দায়িত্ব ও সীমানা ভিন্ন। আপন আপন সীমানায় প্রত্যেকেরই দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলাম উভয়ের জন্য আলাদা আলাদা কর্মক্ষেত্র তৈরি করেছে। নারীর জন্য ঘর, পুরুষের জন্য বাইর। নারীর প্রধান দায়িত্ব দুটি: ক. স্ত্রী হিসেবে স্বামীকে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা দান করা; দুনিয়াবী বিষয়েও, দীনী বিষয়েও। খ. মা হিসেবে সন্তান ধারণ, প্রতিপালন। এ দুটি দায়িত্ব যাতে নারী সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে পারে,

আল্লাহ তা'আলা সেজন্য তাকে যথোপযুক্ত শরীর ও মন-মানসিকতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। সুষ্ঠু মানবসমাজের জন্য নারীর এ দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুদায়িত্ব পালনের উপযুক্ত জায়গাই হলো ঘর। সুতরাং নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য ঘরে থাকতে পারাটা নারীর আল্লাহপ্রদত্ত অধিকার। তার প্রতি হুকুম হলো–

وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ

তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করো।[৩৪]

আল্লাহ তা'আলা যে কোনও হুকুম পালন করার সুযোগ পাওয়া প্রত্যেক মানুষের দীনী অধিকার। ঘরে অবস্থান করা যখন নারীর প্রতি আল্লাহর হুকুম, তখন ঘরে অবস্থানের সুযোগ পাওয়াটাও নিঃসন্দেহে তার অধিকার। যারা নারীকে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে চায়, তারা প্রকৃতপক্ষে নারীর এ অধিকার হরণের তৎপরতায় লিপ্ত। এমনিভাবে যারা ঘরের পরিবেশ নারীর অবস্থানের পক্ষে অস্বস্তিকর করে তোলে, ফলে নারী বাইরে যেতে বাধ্য হয়, তারাও প্রকারান্তরে নারীর এ অধিকার হরণ করছে।

নারী যাতে নিজ ঘরে থেকে আপন দায়িত্ব পালনে মশগুল থাকতে পারে, সেজন্যে শরীয়তের অনেক বিধান তার উপর হালকা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন পুরুষের জন্য মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ পড়া জরুরি, কিন্তু মহিলার জন্য তা জরুরি নয়; বরং তার জন্যে ঘরে নামাজ পড়াই উত্তম। এক হাদীছে এমনটাই বলা হয়েছে।[৩৫] এমনিভাবে জিহাদের বিধান পুরুষদের জন্য, নারীর জন্য নয়। একবার উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. জিহাদের অনুমতি চাইলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

جِهَادُكُنَّ الحَجُّ

তোমাদের জিহাদ তো হজ্জ।[৩৬]

---

[৩৪] সূরা আহযাব : ৩৩

[৩৫] সুনানে আবূ দাউদ : ৫৬৭

[৩৬] সহীহ বুখারী : ২৮৭৫

ঘরে থাকাটা যখন নারীর অধিকার, তখন পুরুষের পক্ষ থেকে খোরপোশ পাওয়াটাও তার অধিকার বৈকি। নারী যখন পিতার কাছে থাকে, তখন পিতার কর্তব্য তার খোরপোশ যোগানো। আর যখন স্বামীর কাছে আসবে, তখন এ দায়িত্ব পালন করবে স্বামী। নারী নিজে কোনওভাবেই নিজ ভরণপোষণের যিম্মাদার নয়। কেননা এ যিম্মাদারী পালন করাটা স্ত্রী ও মা হিসেবে যে যিম্মাদারী তার উপর অর্পিত রয়েছে তা পালনের পক্ষে অন্তরায়। বলাবাহুল্য সে দায়িত্ব পালন করতে না পারাটা গোটা মানবসমাজের জন্যেই ক্ষতিকর। এজন্যই ইসলাম তাকে এ দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষ সমাজকে লক্ষ্য করে বলেন–

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

> নারীদের খোরপোশ ও পোশাক-পরিচ্ছদ যোগানোর দায়িত্ব তোমাদের।[৩৭]

আধুনিক সমাজে অনেকে বিষয়টাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে। তারা নারীর ঘরে থাকাকে তাদের জন্য অমর্যাদাকর এবং সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে অন্তরায় মনে করেন। অথচ বিষয়টা আদৌ তেমন নয়। ঘরে থাকা মানেই পশ্চাতপদতা এবং সমাজ ও সামাজিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা নয়। মূল কথা হলো মানবসমাজের কল্যাণ ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। নারীর দ্বারা সে ভূমিকা রাখা হচ্ছে কিনা সেটাই লক্ষ্যণীয়।

---

[৩৭] সহীহ মুসলিম : ১২১৮

নারী নির্যাতন

নারী নির্যাতন বিশ্বব্যাপী এক গভীর সামাজিক সমস্যা। খুব কম সমাজই এ থেকে মুক্ত। দিন যত গড়াচ্ছে, এ সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠছে। নারী নির্যাতন দ্বারা যে কেবল নারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা কিন্তু নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবার, সমাজ, প্রজন্ম বরং পুরো মানবজাতি। যাকে নির্যাতন করা হয় সে হয়তো শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, কিন্তু তার নির্যাতনের মাত্রাভেদে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, মানসিক বিষণ্নতা ও আত্মহত্যার প্রবণতা সৃষ্টি হওয়া ছাড়াও এর প্রভাব আরও বহুদূর বিস্তারী। যে পরিবারে নারীরা নির্যাতনের শিকার, সেখানকার শান্তি নষ্ট তো হয়ই, সেই সঙ্গে দেখা দেয় পারিবারিক কলহ। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক যে কোনও ধরণের সহিংসতাই নারী নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক প্রকার নির্যাতনেরই রয়েছে বহু রূপ, বহু ধরণ।

এসব নির্যাতন যে অনুন্নত বা দরিদ্র দেশগুলোতেই হয় তা নয়; বরং জাগতিকভাবে উন্নত দেশগুলোয় নারী নির্যাতনের চিত্র আরও প্রকট, আরও বহুমুখী। এ বিষয়ে কিছু পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন তুলে ধরছি।

পশ্চিমা বিশ্বে নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্র

যুক্তরাষ্ট্রের EEOC (Equal Employment Opportunity Commission) কমিশনের ২০২৩-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রায় ৪০-৫০% যৌন হয়রানির শিকার।

- যুক্তরাজ্যের TUC (Trader Union Congress)-এর ভাষ্যমতে দেশটির প্রতি ৩ জনের১ জন কর্মক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হন।

- ২০২৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশে নারীদের প্রায় ৫০% কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বা সহিংসতার শিকার হয়। সূত্রঃ FRA Report
- যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে অবস্থিত কর্ণেল ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে বিগত ৭ জুলাই ২০২৫-এ প্রকাশিত একটি রিসার্চের শিরোনাম হলো– মেক্সিকোতে নারীহত্যা রোধে ব্যর্থ হচ্ছে (Femicide -ফেমিসাইড) নারীহত্যা আইন।
- স্প্যানিশ গভর্নমেন্ট রিপোর্ট-২০২৩ অনুসারে প্রতিবছর স্পেনে প্রায় ৫০ জন নারী পারিবারিক সহিংসতায় নিহত হন।
- ১৬ অক্টোবর ২০২৪-এ প্রকাশিত লে মোঁদ (Le Monde) সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একটি খবরে বলা হয়– আফ্রিকায় শান্তিরক্ষী বাহিনী দ্বারা নারীরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে।
- দ্যা টাইমস অফ ইণ্ডিয়া সংবাদপত্রে ১৫ জুন ২০২৫-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে– ভারতের তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের বিচারক টি. মাধবী বলেন– গত কয়েক দশকে গুরুত্বপূর্ণ আইনগত সংস্কার থাকলেও নারী সম্পর্কিত আইনগুলোর বাস্তবায়ন, সচেতনতা এবং প্রয়োগ এখনও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।
- আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম এপি (দ্যা এসোসিয়েটেড প্রেস) নিউজে বিগত ৬ মার্চ ২০২৫-এ প্রকাশিত একটি খবরের শিরোনাম হলো, বিশ্বব্যাপী নারীদের অধিকার হুমকির মুখে।
- সম্প্রতি ৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদপত্র দ্যা গার্ডিয়ানে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছে– মেক্সিকোর মানবাধিকারকর্মী স্যাণ্ড্রা ডোমিঙ্গেজ ৪ অক্টোবর ২০২৪-এ স্বামীসহ নিখোঁজ হন। তিনি ছিলেন একজন নারীবাদী এবং পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার। নিখোঁজ হওয়ার ছয় মাস পর ২৪ এপ্রিল ২০২৫-এ তাদের মরদেহ উদ্ধার হয়। এ ঘটনা পুরো দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মেক্সিকো, যেখানে বেশিরভাগ

নিখোঁজ মানুষকে কখনওই খুঁজে পাওয়া যায় না, সেখানে তাদের মরদেহ উদ্ধার হওয়া সত্যিই বিরল এক ঘটনা।

- যুক্তরাজ্যভিত্তিক দ্যা টাইমস নিউজপেপারে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়, যেখানে বিখ্যাত মানবাধিকার সংস্থা Oxfam-এর বিরুদ্ধে ২০১৮ সালে হাইতি ও চাদে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনা হয়।
- Department of Veterans Affairs (VA)-তথ্য অনুযায়ী ২০১০ সালে ইরাক বা আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসা নারী সৈন্যদের ২০% অর্থাৎ প্রতি পাঁচজনের একজন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।



শারীরিক নির্যাতন

এতক্ষণকার আলোচনা ছিল সাধারণভাবে মানুষের জান, মাল ও ইজ্জতের অধিকার সম্পর্কে। নারী-পুরুষ উভয়েই এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবার আমরা বিশেষভাবে নারীর বেলায় যে এ তিনও প্রকার অধিকার হরণ করা হয় এবং নানাভাবেই তা করা হয় সেদিকে নজর দেব।

শারীরিক নির্যাতন বলতে বোঝায় এমনসব আক্রমণাত্মক বা জোরপূর্বক আচরণ, যা ভুক্তভোগীর শরীরে সরাসরি আঘাত বা ক্ষতি করে। এটি নারী নির্যাতনের সবচেয়ে দৃশ্যমান রূপ। এর অনেক ধরণ আছে। যেমন চড়-থাপ্পড়, কিল-ঘুষি, লাথি, ধাক্কা, চুল ধরে টানা, লাঠি, বেল্ট, বৈদ্যুতিক তার বা অন্য কোনও বস্তু দ্বারা আঘাত করা, আগুন, গরম পানি বা এসিডদগ্ধ করা, শ্বাসরোধ করা ইত্যাদি।

সরাসির আঘাত করা ছাড়াও শারীরিক নির্যাতন হতে পারে। যেমন অসুস্থ বা দুর্বল অবস্থায় ভারী কাজে বাধ্য করা, চিকিৎসা না করিয়ে কষ্টকর কাজ করাতে থাকা ইত্যাদি।

ইসলামে এসবই হারাম বা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ এর দ্বারা নারীর জানের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়। ইসলাম সকল নারীকেই নিরাপদ বাঁচার অধিকার দিয়েছে। সে অধিকার ক্ষুণ্ন করা তো নয়ই; বরং ইসলামের হুকুম হলো নারীর প্রতি সম্মানজনক আচরণ করো। তার প্রতি কোমল ব্যবহার করো। বলা হয়েছে–

وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে,

> তোমরা কোনও জিনিসকে অপসন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।[৩৮]

এ আয়াতে স্বামীকে নির্দেশ করা হয়েছে স্ত্রীর প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করতে। বলা হয়েছে, যদি স্ত্রীর কোনও কিছু অপসন্দ হয়, তবে অধৈর্য্য না হতে। কেননা আল্লাহ তা'আলা হয়তো তাতেই কল্যাণ রেখেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি, বলেন– অপসন্দ সত্ত্বেও যদি ধৈর্য্য সহকারে স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখা হয়, তবে হয়তো আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া আখেরাতে প্রভূত কল্যাণ দান করবেন, যেমন হয়তো সেই স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দান করবেন, যে সমূহ কল্যাণ বয়ে আনবে।[৩৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীছে ইরশাদ করেন–

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ.

> কোনও মুমিন (স্বামী) যেন কোনও মুমিনা (স্ত্রী)কে ঘৃণা না করে। তার কোনও একটি স্বভাব যদি অপসন্দ হয়, তবে অন্য একটি স্বভাব অবশ্যই তার পসন্দ হবে।[৪০]

অপর এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ.

> তোমাদের কেউ যেন দাস পেটানোর মতো স্ত্রীকে না পেটায়।[৪১]

এর মানে দাস পেটানোকে বৈধতা দেওয়া নয়; ইসলাম তো দাস পেটানোকেও নিষিদ্ধ করেছে। হযরত আবু মাসঊদ আনসারী রাযি. একদিন তার গোলামকে পেটাচ্ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে ফেলেন। তিনি তাকে এই বলে সতর্ক করেন– জেনে রেখো হে আবু মাসঊদ! এ গোলামের প্রতি তোমার যা ক্ষমতা, তোমার প্রতি

---

[৩৮] সূরা নিসা : ১৯
[৩৯] তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা নিসা : ১৯
[৪০] সহীহ মুসলিম : ১৪৬৯
[৪১] সহীহ বুখারী : ৫২০৪

আল্লাহর ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশি। হযরত আবু মাসউদ বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। তিনি বললেন– তা না করলে আগুন তোমাকে জ্বালিয়ে দিত।[৪২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাস-দাসীদেরকে মুমিনদের ভাই সাব্যস্ত করেছেন এবং হুকুম দিয়েছেন, তোমরা নিজেরা যা খাও তাদেরকে তা-ই খাওয়াবে এবং নিজেরা যা পর তাদেরকে তা-ই পরাবে।[৪৩]

এই যখন দাস-দাসীদের প্রতি আচরণে ইসলামের নির্দেশনা, তখন স্ত্রীদের প্রতি আচরণ কেমন হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জাহিলী যুগে স্ত্রীদেরকে মারধোর করার ব্যাপক রেওয়াজ ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন–

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ

তোমরা আল্লাহর বান্দিদের মারবে না।[৪৪]

যারা মারধোর করতে তাদের সম্পর্কে সাফ মন্তব্য করেন–

لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ

এরা তোমাদের মধ্যে ভালো লোক নয়।[৪৫]

স্ত্রীদের প্রতি যে কোনও অন্যায় আচরণ প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো আল্লাহভীতি বা তাকওয়ার গুণ অর্জন করা। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً

হে লোক সকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে

[৪২] সহীহ মুসলিম : ১৬৫৯
[৪৩] সহীহ বুখারী : ৩০
[৪৪] সুনানে আবু দাউদ : ২১৪৬
[৪৫] প্রাগুক্ত

> সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন।

এ আয়াত মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়– নারী ও পুরুষ একই উৎস থেকে সৃষ্টি। কাজেই প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি আচরণে যেন আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহভীতির সঙ্গে কেউ কারও উপর যুলুম করতে পারে না।[৪৬]

তাছাড়া কারও উপর শারীরিক নির্যাতন করার অর্থ তার জানের অধিকার ক্ষুণ্ন করা। ইতঃপূর্বে অধিকার সংশ্লিষ্ট আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।



[৪৬] সূরা নিসা : ০১

যৌন নির্যাতন

যৌন নির্যাতন হলো কোনও নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন আচরণে বাধ্য করা, অথবা শারীরিক, মৌখিক বা অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে যৌন হয়রানি করা। যৌন নির্যাতন নারীর মর্যাদা, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার উপর ভয়াবহ আঘাত হানে। এটি কেবলই একটি অপরাধ নয়; বরং আল্লাহপ্রদত্ত মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারের চরম লঙ্ঘন। এর দ্বারা নারীর নিরাপদ ও সম্মানজনক বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করা হয়। এভাবে যৌন নির্যাতন নারীর জানের অধিকার ও ইজ্জত-সম্ভ্রমের অধিকার– এ দুই অধিকারই পদদলিত করা হয়। ইসলাম নারীকে 'محصنة' তথা' 'সুরক্ষিত রত্ন'[৪৭] হিসেবে বিবেচনা করেছে। যৌন নিপীড়ন নারীর এ সম্মান ভুলুণ্ঠিত করে।

বর্তমানে যৌন নির্যাতন একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে পরিগণিত। এটা এক ভয়াবহ সামাজিক ফিতনা। নারীর প্রতি এর প্রকাশ হয় নানান রূপে। যেমন ধর্ষণ, অশ্লীল মন্তব্য, কুরুচিপূর্ণ আচরণ, লোলুপ দৃষ্টি ইত্যাদি। ঘৃণিত এসব কাজে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে, পরিবেশ-পরিস্থিতি কলুষিত হয়।

আজ নারীর প্রতি যৌন হয়রানি এমন মহামারি আকার ধারণ করেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে নারী আজ নিজ ঘরে পর্যন্ত নিরাপদ নয়। অনেকে নারীদের ভাবাবেগ ও বিভিন্ন দুর্বলতার সুযোগ নেয়। নিকটাত্মীয়রা এই ভেবে নির্যাতন করে যে, তাদের বিরুদ্ধে হয় অভিযোগ তোলাই হবে না, কিংবা অভিযোগ তুললেও কেও তা শুনবে না। সাধারণত বদনামীর ভয়ে অভিযোগ করেই না। ফলে হয়রানির সুযোগ পেয়ে যায়।

এ বিষয়ে অভিভাবকদের কর্তব্য আছে। নারীদের আত্মসচেতনরূপে গড়ে তুলতে হবে। তাদের ভেতর আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করতে হবে।

---

[৪৭] সূরা নিসা : ২৪

পিতামাতার কর্তব্য ঘরে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে নারীরা তাদের সমস্যাগুলো খুলে বলতে পারে। এমন পরিবেশ তৈরি না হলে তারা ন্যায়বিচার পাবে না। তারা মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

যাহোক, নারীর প্রতি যৌন হয়রানিমূলক যে কোনও আচরণ অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। আমাদের মহান দীন ইসলাম সে জাতীয় ন্যাক্কারজনক আচরণ কঠিনভাবে নিষেধ করেছে। ইসলামে ব্যাভিচার এক জঘন্য অপরাধ। কঠিনতম পাপসমূহের একটি। তাই ব্যাভিচার তো বটেই, এর ধারেকাছের আচরণও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَ سَآءَ سَبِيْلًا

তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীলতা ও বিপথগামিতা।[৪৮]

ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না কথাটির মধ্যে যৌন হয়রানির যাবতীয় ধরণ অন্তর্ভুক্ত। নারী যেন তার ইজ্জত-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা লাভ করে এজন্য ইসলাম বহুমাত্রিক নির্দেশনা জারি করেছে। যেমন,

এক. বাইরে অশালীন ঘোরাফেরা না করা। ইরশাদ হয়েছে–

وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করো এবং (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না, যেমন প্রাচীন জাহিলী যুগে প্রদর্শন করা হত।[৪৯]

এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

নারী আবরণযোগ্য। যখনই সে বের হয় শয়তান তাকে উঁকি মেরে দেখে।[৫০]

---

[৪৮] সূরা বনী ইসরাঈল : ৩২

[৪৯] সূরা আহযাব : ৩৩

[৫০] জামে' তিরমিযী : ১১৭৩

দুই. অনুমতি ছাড়া অন্যের ঘরে ঢোকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ। ইরশাদ হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

হে মুমিনগণ! নিজ গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ কর ও তার বাসিন্দাদেরকে সালাম দাও। এ পন্থাই তোমাদের জন্য শ্রেয়। আশা করা যায়, তোমরা লক্ষ রাখবে।[৫১]

তিন. দৃষ্টি অবনত রাখা। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই ইসলামে এ সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। পুরুষদের প্রতি ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ

মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য শুদ্ধতর।[৫২]

আর নারীদের প্রতি ইরশাদ হয়েছে–

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ

মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।[৫৩]

কুদৃষ্টি হলো শয়তানের তীর। এটা ব্যাভিচারের প্রথম ধাপ। দৃষ্টির হেফাজত করা গেলে ব্যাভিচার থেকে বাঁচা সহজ হয়। বস্তুত অবনত দৃষ্টি কেবল কুচিন্তা ও মানসিক পদস্খলনই রোধ করে না, এটা সৌন্দর্য্যেরও প্রকাশ। অবনত দৃষ্টি ব্যক্তির দেহমনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় ও ভাবমূর্তি তৈরি

[৫১] সূরা নূর : ২৭
[৫২] সূরা নূর : ৩০
[৫৩] সূরা নূর : ৩১

করে। জান্নাতি নারীদের একটা বিশেষ গুণ হলো– তারা হবে قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ' তথা আনতনয়না।[৫৪]

চার. লজ্জাশীলতা ও শালীনতা। লজ্জাশীলতা ও শালীনতা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

লজ্জা ঈমানের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।[৫৫]

মানুষের ঈমান-আমল হেফাজতের জন্য এ গুণ অত্যন্ত কার্যকর। নারীর ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষার পক্ষেও এটা অত্যন্ত সহায়ক। এটা নারীর সত্যিকারের ভূষণ। নিঃসন্দেহে পুরুষেরও। পোশাক-আষাক ও চালচলনের শালীনতা নারীর প্রতি পুরুষমনে শ্রদ্ধা ও সমীহাবোধ তৈরি করে। ফলে দুর্বৃত্তদের হয়রানিমূলক আচরণ থেকে নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত হয়।

পাঁচ. ধীর-শান্ত চালচলন। ইসলাম নারীদের ধীর-শান্ত পায়ে চলতে উৎসাহিত করেছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

মুসলিম নারীদের উচিত ভূমিতে এভাবে পদক্ষেপ না করা, যাতে তাদের গুপ্ত সাজ জানা হয়ে যায়।[৫৬]

ছয়. কথার শালীনতা। কথা বলার সময় আকর্ষণীয় ভঙ্গী অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা তা অনাকাঙ্ক্ষিত আকর্ষণ তৈরি করে। কুরআন মাজিদের হুকুম–

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ

তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, পাছে অন্তরে ব্যাধি আছে এমন ব্যক্তি লালায়িত হয়ে পড়ে।[৫৭]

[৫৪] সূরা আর-রহমান : ৫৬
[৫৫] সহীহ মুসলিম : ৩৫
[৫৬] সূরা নূর : ৩১
[৫৭] সূরা আহযাব : ৩২

সাত. পর্দা রক্ষা করা। পর্দা নারীমর্যাদার জন্য দূর্গস্বরূপ। ঘরে-বাইরে সর্বত্র নারীর ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষার পক্ষে পর্দা সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। কুরআন মাজিদে আদেশ করা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, তোমার কন্যাদের ও মুমিনদের স্ত্রীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের (মুখের) উপর নামিয়ে দেয়। এ পন্থায় তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।[৫৮]

একদল মুনাফেক রাস্তাঘাটে মুমিন নারীদেরকে উত্ত্যক্ত করত। এ আয়াতে পর্দার সাথে চলাফেরা করার একটা উপকার এই নির্দেশ করা হয়েছে যে, পর্দার সাথে চলাফেরা করলে সকলেই বুঝতে পারবে তারা শরীফ ও চরিত্রবতী নারী। ফলে মুনাফেকরা তাদেরকে উত্ত্যক্ত করার সাহস করবে না। যারা বেপর্দা চলাফেরা করে ও সেজেগুজে বের হয় তারাই রাস্তাঘাটে বেশি ঝুট-ঝামেলার শিকার হয়। আল্লামা ইবনে হাইয়্যান আয়াতটির এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন (আল-বাহরুল মুহীত)।

এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে– যেসকল নারী এমন পোশাক পরে, যেন সে উলঙ্গ, যারা অন্যদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে বেড়ায়, তারা জান্নাতে তো যাবেই না; জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।[৫৯]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ

[৫৮] সূরা নূর : ৩১
[৫৯] সহীহ মুসলিম : ২১২৮

> মুমিন নারীরা যেন নিজেদের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে, যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া এবং তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল নিজ বক্ষদেশে নামিয়ে দেয় এবং নিজেদের ভূষণ যেন স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনেয়, আপন নারীগণ, যারা নিজ মালিকানাধীন, যৌনকামনা নেই এমন পুরুষ খেদমতগার এবং নারীদের গোপনীয় অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া আর কারও সামনে প্রকাশ না করে।[৬০]

অধুনা সমাজে নারীনির্যাতনের নতুন একটি রূপ হলো সাইবার হ্যারেজমেন্ট বা অনলাইনে যৌন হয়রানি। সাইবার হ্যারেজমেন্ট অনলাইনে সবধরণের হয়রানিকে বোঝায়। এর মধ্যে যৌন হয়রানি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অনলাইনে ভুয়া প্রোফাইল তৈরি করে অপমানজনক কন্টেন্ট প্রকাশ করা, ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও অনুমতি ছাড়া ছড়িয়ে দেওয়া, যৌন উস্কানীমূলক বার্তা পাঠানো, হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে কারও ব্যক্তিগত জীবনে নজরদারি করা ইত্যাদি। বর্তমানে এর বিস্তার ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। দ্যা ডেইলি স্টারে ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে– বাংলাদেশে ৭৮%-এর বেশি নারী অনলাইনে হয়রানির শিকার হয়েছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীদের সম্পর্কে এরূপ মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে হয়রানি করা 'কাযফ' বা অপবাদ বলে বিবেচিত এবং এর জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির বিধান। ইরশাদ হয়েছে–

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

> যারা সতী-সাধ্বী নারীকে অপবাদ দেয়, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না। তাদেরকে আশিটি চাবুক মারবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করবে না। তারা নিজেরাই তো ফাসেক।[৬১]

---

[৬০] সূরা নূর : ৩১

[৬১] সূরা নূর : ০৪

এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ মুমিন সতী নারীকে অপবাদ দেওয়াকে ধ্বংসাত্মক বলে অভিহিত করেছেন।[৬২]

বিবাহকে উৎসাহিত করা

ইসলাম অশ্লীলতা ও ব্যভিচার রোধ করার লক্ষ্যে যেমন বিভিন্ন বিধি-বিধান দিয়েছে, তেমনি মানুষকে উৎসাহিত করেছে সে যেন তার স্বভাবগত যৌনচাহিদা বৈধ পন্থায় পূরণ করে। সে হিসেবেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে–

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآىِٕكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

> তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত (তারা পুরুষ হোক বা নারী) তাদের বিবাহ সম্পাদন করো এবং তোমাদের গোলাম ও বাঁদিদের মধ্যে যারা বিবাহের উপযুক্ত, তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।[৬৩]

এ আয়াতে যেমন অভিভাবকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন বিবাহের উপযুক্তদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে, তেমনি বলা হয়েছে বিবাহকে সহজ করতে। তা এভাবে যে, বিয়ের জন্য খুব বেশি সামর্থ্যের প্রয়োজন নেই। বর্তমানে যেরূপ সামর্থ্য আছে এর ভিত্তিতেই বিয়ের ব্যবস্থা করা চাই। ভবিষ্যতের অমূলক আশঙ্কায় বিয়ে বিলম্বিত করা মোটেও সমীচীন নয়। চরিত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে বিয়ের ব্যবস্থা করলে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করবেন এবং নিজ অনুগ্রহ দ্বারা অভাব-অনটন দূর করে দেবেন। এভাবেই ইসলাম বিয়ের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং বিয়ে সহজ করার নির্দেশনা দিয়েছে।

বিয়ের খরচ যেন কারও কাছে বোঝা মনে না হয় সেজন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

---

[৬২] সহীহ বুখারী : ২৭৬৬

[৬৩] সূরা নূর : ৩২

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً

সবচেয়ে বরকতময় বিয়ে সেটাই, যার খরচ সবচেয়ে কম।[৬৪]

আরেক হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে, কারণ এটি দৃষ্টি সংযম ও লজ্জাস্থানকে হেফাজত করতে অধিক কার্যকরী।[৬৫]

বিয়ে যেন অহেতুক শর্তাবলিতে আটকে গিয়ে বিলম্বিত না হয় সেজন্য ইরশাদ হয়েছে–

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ،إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

যদি তোমাদের কাছে এমন ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দীনদারি ও চরিত্র নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট তবে তার (সঙ্গে তোমাদের মেয়ের) বিয়ে দিয়ে দাও। যদি তা না কর তবে পৃথিবীতে ফিতনা ও বড় বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে।[৬৬]

লক্ষ্যণীয় এ হাদীছে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র নির্বাচনে পাত্রের দীনদারী ও চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অপর এক হাদীছে পাত্রী নির্বাচনের বেলায়ও একই নির্দেশ এসেছে। বলা হয়েছে–

تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

[৬৪] মুসনাদে আহমাদ : ২৪৫২৯
[৬৫] সহীহ বুখারী : ৫০৬৬
[৬৬] জামে' তিরমিযী : ১০৮৪

> নারীকে বিয়ে করা হয় চার কারণে– তার সম্পদের কারণে, তার আভিজাত্যের কারণে, তার সৌন্দর্য্যের কারণে ও তার দীনের কারণে। তুমি দীনদার নারী বিয়ে করে ধণ্য হয়ে যাও।[৬৭]

খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। ইসলাম নারী-পুরুষ সকলেরই মর্যাদা নির্ণয়ে স্থূল দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে মানবিক উৎকর্ষকে মাপকাঠি বানিয়েছে। অর্থ-সম্পদ ও রূপ-লাবণ্যের আকর্ষণ দুদিনের। আখলাক-চরিত্রের মাধুর্য না থাকলে স্থূল এ আকর্ষণ অপরপক্ষকে বেশিদিন টানতে পারে না; বরং দুদিনের মোহ এক পর্যায়ে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় পর্যবসিত হয়। বর্তমান দুনিয়া সেই ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার জ্বালায় জর্জরিত। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে হাদীছের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। আকার-আকৃতি নয়; বরং প্রকৃতি ও গুণের মূল্যায়ন করতে হবে। নিজের ভেতরও আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের সাধনা করতে হবে। অপরপক্ষের ভেতরও এরই অনুসন্ধান করতে হবে।

ব্যভিচারের শাস্তি

যৌন হয়রানি রোধে ইসলামি নির্দেশনা বড় চমৎকার। প্রথমত সকলকে তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়েছে। তারপর নারীর মর্যাদা, নারী নির্যাতনের ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করেছে। নানামুখী বিধান দিয়ে যৌন নির্যাতনের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। জৈবিক চাহিদাপূরণে বিয়ের বিধান আরোপ করেছে। এরপরেও যদি কেউ এরূপ ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হয়, তার জন্য প্রণয়ণ করেছে কঠিন শাস্তির বিধান। ইসলামী বিধানমতে ধর্ষণকারীর উপর আরোপ হবে ব্যভিচারের শাস্তি। অবিবাহিতের বেলায় ব্যভিচারের শাস্তি হলো একশো চাবুক মারা। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী– তাদের প্রত্যেককে একশত চাবুক

[৬৭] সহীহ বুখারী : ৫০৯০

> মারবে। তোমরা যদি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখ, তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি করুণাবোধ যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।[৬৮]

বিবাহিত নর-নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে সেক্ষেত্রে শাস্তি অধিকতর কঠোর– পাথর মেরে হত্যা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এরূপ শাস্তি আরোপ করেছেন।[৬৯]

নারীর প্রতি যৌন নির্যাতন রোধে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ জরুরি। ব্যক্তি পর্যায়ে তাকওয়ামুখী ও দীনী জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হওয়া, পোশাকে ও আচার-ব্যবহারে শালীনতা বজায় রাখা, দৃষ্টি সংযত রাখা এবং অশ্লীল পরিবেশ ও অপরাধ প্রবণ পরিবেশ থেকে দূরে থাকা উচিৎ। পারিবারিক পর্যায়ে লজ্জাশীলতা, পর্দা ও পরিশীলিত মেলামেশার পরিবেশ গড়ে তোলা চাই। অবৈধ সম্পর্ক রোধ ও বিয়েকে সহজ করার জন্য দরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। সামাজিক পর্যায়ে দরকার সচেতনতা বৃদ্ধি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদে-মজলিসে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যৌন নির্যাতনের ভয়বহতা ও নারীর মর্যাদা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিৎ। অপরাধকে যেন গোপন করা বা ধামাচাপা দেওয়া না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। সামাজিকভাবে যেকোনও অন্যায়কে শক্তভাবে প্রতিহত করা চাই। সর্বত্র বাস্তবায়িত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী–

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

> তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় কাজ দেখে, সে যেন তা হাতে প্রতিহত করে। হাতে না পারলে মুখে আর মুখে না পারলে অন্তরে। আর এটা ঈমানের দুর্বলতম স্তর।[৭০]

---

[৬৮] সূরা নূর : ০২

[৬৯] সহীহ বুখারী : ৭১৬৭

[৭০] সহীহ মুসলিম : ৪৯

যৌন নির্যাতন রোধে রাষ্ট্রীয়ভাবে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ। দরকার আইনের কঠোর প্রয়োগ ও অপরাধীর দ্রুত বিচার কার্যকর করা। রাষ্ট্রীয়ভাবেও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে নানামুখী পদ্রক্ষপ গ্রহণ করা চাই। চাই নারীর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা। নির্যাতনের প্রমাণ সংগ্রহে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করে ভুক্তভোগীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। গণমাধ্যমকে অশ্লীলতা, পর্ণোগ্রাফী, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ যাবতীয় বিষয় থেকে মুক্ত করা। অবাধ মেলামেশা নিয়ন্ত্রণ করা। সর্বোপরি ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং ইসলামী বিধিবিধানের বাস্তবায়ন করা।



মানসিক নির্যাতন

নারীর প্রতি মানসিক নির্যাতন হলো এমন অস্পৃশ্য সহিংসতা বা আঘাত, যা নারীর মনোজগত, আত্মসম্মান ও মানসিক স্বাস্থ্যকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ নির্যাতন অদৃশ্য হলেও এর প্রভাব দূরবিস্তারি। এরও রয়েছে নানা ধরণ। যেমন গালাগাল করা, অপমান ও অসম্মানজনক কথা বলা, বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেওয়া ইত্যাদি। ঘরে বাইরে, আপন-পর নির্বিশেষে সকল নারীর প্রতিই এরূপ আচরণ সর্বত্র লক্ষ করা যায়। নারীর এরূপ অবমূল্যায়নের অর্থ তার ব্যক্তিগত সম্মানের অধিকার ক্ষুণ্ন করা। ইতঃপূর্বে মানুষের যে সকল মৌলিক অধিকার ও তার অমর্যাদা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে সম্মানের অধিকারের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। সেসবের পুনঃউল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মানসিক নির্যাতনের আরও চিত্র আছে। যেমন ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া। আমাদের সমাজে স্ত্রীকে তালাকের ভয় দেখানো, সন্তান কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেওয়া, নিঃসঙ্গ করে দেওয়ার ভয় দেখানো, আর্থিক সহায়তা বন্ধের হুমকি, অন্য নারীর বিয়ে ভেঙে দেওয়ার হুমকি প্রদান ইত্যাদি সবই নিত্যদিনের মানসিক নির্যাতনের চিত্র।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব, নেকাব ও বোরকা পরতে না দেওয়াও এক প্রকার মানসিক নির্যাতন। অফিস-আদালতের বেলায়ও তাই। একটা মুসলিম প্রধান দেশে এরূপ মানসিক নির্যাতন কল্পনা করা যায় না।

কোনও কোনও পুরুষ কথায় কথায় নারীকে অবজ্ঞা করে। তার মতামত অগ্রাহ্য করে। অনেকে নারীর কথা শুনতেই চায় না। তার ভাবাগেরও মূল্য দেয় না। আচরণ করে আধিপত্যমূলক। সবকিছুতে কর্তৃত্বপরায়ণতা। এর দ্বারা নারীকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলা হয়। এ শ্রেণির

পুরুষ নারীর প্রতি তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ঠিক বুঝতে পারে না। ইসলাম পুরুষকে যে নারীর অভিভাবক বানিয়েছে, এর সঠিক মূল্যায়ন তারা করতে পারে না। তারা এর অর্থ বুঝেও ভুল, এর প্রয়োগও করে ভুল। ফলে 'অভিভাবক' কথাটিই নেতিবাচকতায় পর্যবসিত হয়েছে। ইদানীং নারীও শব্দটিকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। এ শব্দটি যেন তাদের অমর্যাদা ও তাদের প্রতি অন্যায় আচরণের ছত্রচ্ছায়া। তাই এ বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

পুরুষের 'قوامة' বা অভিভাবকত্ব-এর অর্থ

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেছেন–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

> পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।[৭১]

আয়াতে পুরুষকে অভিভাবক বলা হয়েছে। শরিয়তের অন্যান্য বিধানের মতো এই অভিভাবকত্বও পুরুষের প্রতি শরিয়তের এক বিশেষ বিধান। এই বিধানের দাবি হলো পুরুষ নারীর দায়িত্বশীল হবে, রক্ষণাবেক্ষণকারী হবে, খরচ বহন করবে, তার নিরাপত্তা ও সবরকমের কল্যাণ নিশ্চিত করবে এবং তার জন্য ঘরে এরকম পরিবেশ নিশ্চিত করবে, যাতে সে তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব স্বস্তির সঙ্গে আঞ্জাম দিতে পারে। কিন্তু 'قوامة' সম্পর্কে রয়েছে ব্যাপক অপপ্রচার। আমাদের এক শ্রেণির পুরুষের কারণে সে অপপ্রচার আরও বেগবান হচ্ছে। তারা সমাজে এই অভিভাবকত্বকে এমনভাবে প্রয়োগ করছে, মনে হয় যেন পুরুষ নারীর শাসক, একচ্ছত্র অধিপতি, তার উপর নারীর মতামতের কোনও মূল্য নেই, নারীর আবেগ-অনুভূতি মূল্যহীন, নারীকে নিয়ন্ত্রণ, তুচ্ছজ্ঞান ও দমন-নিপীড়ণ করা বৈধ ইত্যাদি ইত্যাদি। এককথায় আয়াতে যেন পুরুষকে নারীর উপর স্বৈরশাসক বানানো হয়েছে। অথচ ইসলামী আদর্শ এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

[৭১] সূরা নিসা : ৩৪

ইসলামে পুরুষকে প্রধান করা হয়েছে– এর অর্থ পুরষকে তার পরিবারের জন্য দায়বদ্ধ করা হয়েছে এবং পরকালে তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যেমন এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ.

> পুরুষ তার পরিবারবর্গের দেখভালকারী, সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৭২]

অর্থাৎ পুরুষকে তার স্ত্রী-সন্তানদের দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে বলা হয়নি।

নারীর প্রতি অযত্ন-অবহেলা

নারীর উপর মানসিক নির্যাতনের এক বিশাল অধ্যায় অযত্ন ও অবহেলা। আমাদের পরিবারগুলোতে দেখা যায় স্বামীরা স্ত্রীর প্রতি নানাভাবে অবহেলা করে থাকে। যেমন–

* চিকিৎসার ক্ষেত্রে অবহেলা। অনেক স্বামী তার স্ত্রী অসুস্থ হলেও ঠিকভাবে খোঁজ-খবর রাখে না এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয় না।

* গর্ভাবস্থাটা একজন নারীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা স্পর্শকাতর ও কঠিন সময়। এ সময় স্বামী ও স্বামী পরিবারের সকলের কর্তব্য তার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া। তার খাওয়াদাওয়া ও তার বিশ্রামের প্রতি আলাদা দৃষ্টি রাখা। কিন্তু বহু পরিবারে এ বিষয়ে অবহেলা করা হয়ে থাকে।

* স্ত্রীর রুচি-অভিরুচিকে পাত্তা না দেওয়া। তারও যে রুচি-অভিরুচি থাকতে পারে, তা অনেকটা কল্পনাতীত হয়ে গেছে। স্বামী ও স্বামী পরিবারের সকলেরই এটা থাকবে, কিন্তু তার যেন এটা থাকতে নেই।

* মতামতকে অগ্রাহ্য করা। পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন জন

[৭২] সহীহ মুসলিম : ১৮২৯

মতামত দিয়ে থাকে। সেসব মতামতের গুরুত্বও দেওয়া হয়। কিন্তু স্ত্রীরও যে কোনও মত থাকতে পারে তা চিন্তা করা হয় না। না তা জিজ্ঞেস করা হয়, আর না তা বললেও কর্ণপাত করা হয়।

* মান-অভিমানকে অমর্যাদা করা। মান-অভিমান মানুষের এক মূল্যবান অনুভূতি। সবাই এর মূল্য দিতে জানে না। স্ত্রীর বেলায় যেন এটা মূল্য দেওয়ারই যোগ্য নয়।

* সন্তানের নাম রাখার বেলায় সকলের পসন্দ গুরুত্ব পায়, কিন্তু সেই সন্তানের যিনি গর্ভধারিনী, তার কী পসন্দ তা জিজ্ঞেস করা হয় না। বহু পরিবারে তার যেন নাম পসন্দ করার অধিকারই নেই। দেবর, ভাসুর, স্বামীর চাচাত ভাই, ফুফাত ভাই, মামাত বোন, খালাত বোন আরও যারা আছে তারা নাম পসন্দ করবে, সে পসন্দ অনুযায়ী নাম হয়ত রাখাও হবে, আর এভাবে তাদেরকে খুশি রাখারও চেষ্টা করা হবে, কিন্তু গর্ভধারিনী মায়ের বেলায় তা কেউ ভাবে না, ভাবতে চায়ও না।

* পূরণযোগ্য চাহিদা ও আবদার উপেক্ষা করা। চাহিদা বা আবদার আপনজনেরাই প্রকাশ করে থাকে। তা পূরণ করা একটা আনন্দেরও বিষয়। কিন্তু সে আনন্দ স্ত্রীর বেলায় কেউ বোধ করে না। তার সামান্য সামান্য আবদারও উপেক্ষিত থেকে যায়।

* স্ত্রীর বিশেষ কোনও প্রতিভা ও দক্ষতা থাকলে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করাও এক প্রকার অবহেলা প্রদর্শন বৈকি। এ অবহেলার কারণে কত প্রতিভা ভেতরে ভেতরেই নিঃশেষ হয়ে যায়! কত দক্ষতা যায় চিরতরে হারিয়ে!

অনেক স্বামী স্ত্রীর প্রয়োজন পূরণ করে বটে, কিন্তু তা করে নিজের মনের মতো। অর্থাৎ স্ত্রীর যে প্রয়োজন স্বামীর দৃষ্টিতে প্রয়োজন বলে মনে হয় তা পূরণ করে, নতুবা করে না। অথচ প্রয়োজনটা যার, মূল বিবেচনাও তার হওয়া উচিৎ। এসব ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের অবহেলার দৃশ্য বড় করুণ। এসব অবহেলার ক্ষতি কিন্তু গভীর। স্ত্রীর মনে ক্ষোভ, দুঃখ ও আত্মসম্মানহানি তৈরি হয়। ঘটে কঠিন মানসিক অসুস্থতাও। স্ত্রীরা কর্মোদ্যম হারিয়ে ফেলে, বিষণ্ন হয়ে পড়ে। এমনকি দেখা দেয় আত্মহত্যার প্রবণতা। ফলে দাম্পত্যের মাধুর্য হারিয়ে যায়, আস্থা ও ভালোবাসার জায়গা নষ্ট হয়। এরই ফলশ্রুতিতে সন্তানদের মানসিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রকারান্তরে সমাজ ক্ষতির শিকার হয়। UNFPA-Bangladesh 2024-এর সার্ভে অনুসারে ৭০% নারী জীবদ্দশায় কোনও না কোনও শারীরিক, মানসিক, আর্থিক বা নিয়ন্ত্রণমূলক নির্যাতনের শিকার।

নারীর প্রতি মানসিক নির্যাতনের আছে আরও বিচিত্র রূপ। যেমন পরিবারের সিদ্ধান্তে স্ত্রীকে না রাখা, একান্ত দাম্পত্য জীবনে স্বামীর নিজস্ব চাহিদাকে সর্বেসর্বা মনে করা, আত্মীয়-স্বজনের কাছে স্ত্রীকে অবমূল্যায়ন করা, স্ত্রীকে পর্যাপ্ত সময় না দেওয়া, অকারণে সন্দেহ করা, মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা ইত্যাদি।

ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল

একরকম সূক্ষ্ম মানসিক নির্যাতনও আছে। তা হলো ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল। অর্থাৎ স্বামীরা নিজেদের আবেগ ও ভালোবাসার নামে নারীদের উপর অনাকাঙ্ক্ষিত চাপ সৃষ্টি করে। নিজের আবেগকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে স্ত্রীকে বাধ্য করে। নাওয়াখাওয়া ছেড়ে দেয়, ঘর থেকে বের হয়ে যায়, নিজেকে অযত্ন-অবহেলার মুখে ঠেলে দিয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু আদায় করে নেয়, কিংবা স্ত্রীকে কিছু করতে বা মেনে নিতে বাধ্য করে। এতে স্ত্রী অপরাধবোধে ভোগে এবং স্বামীর সব কথা মুখ বুজে মেনে নেয়, এমনকি তা অন্যায় হলেও। এভাবে নিজেকে

ক্ষতির মুখে ঠেলে দিয়ে কারও থেকে কিছু আদায় করা কিছুতেই ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামের ঘোষিত মূলনীতি হলো–

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না, অন্যেরও ক্ষতি করা যাবে না।[৭৩]

মানসিক নির্যাতনের ক্ষতি

মানসিক নির্যাতনের ক্ষতি বহুবিধ। এর দ্বারা নারীর আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়। ভেতরে হতাশা সৃষ্টি হয়। নির্যাতিতা নারী আত্মমর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলে। সে হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে যায়। তার প্রতিভার অবদমন হতে থাকে। এক পর্যায়ে সে নিজেকে অথর্ব জ্ঞান করে। ভাবতে শুরু করে– সে কোনও কাজেরই নয়। এর ফলে কর্মোদ্দীপনাও হারিয়ে ফেলে। তাকে বিষণ্নতায় পেয়ে বসে। বিষণ্নতা তার স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি তা অনেক সময় আত্মহত্যারও ঝুঁকি সৃষ্টি করে। বিষণ্নতা পরিণামে আত্মহত্যায় পর্যবসিত হয়েছে এমন ঘটনা বিরল নয়। এ সবই মানসিক নিপীড়ণের কুফল।

সুতরাং এসব বিষয়ে শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি। দরকার পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করা। এছাড়াও প্রয়োজন আইনি সুরক্ষা দান, ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের কাউন্সেলিং ও সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং সমাজের সর্বস্তর থেকে সংশোধন ও প্রতিবাদের আওয়াজ ওঠানো।

---

[৭৩] সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৩৪১

তালাকের বিধান : বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিকতা

মানসিক নির্যাতনের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো তালাকের অপব্যবহার। তালাক মূলত বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি টানার শরীয়তসম্মত পদ্ধতি। দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটানো যখন জরুরি হয়ে পড়ে, একসঙ্গে থাকাটা যখন প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখনই আসে তালাকের প্রসঙ্গ। ইসলাম তালাকের অনুমোদন দিয়েছে নির্বিকল্প অবস্থায়। অর্থাৎ যখন কোনও অবস্থায়ই বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে না, সুখের বদলে অশান্তি, কল্যাণের বিপরিতে ফিতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন নিরূপায় অবস্থায় ইসলাম তালাকের অনুমোদন দিয়েছে। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

> আল্লাহ তা'আলার কাছে হালাল জিনিসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অপসন্দনীয় হলো তালাক।[৭৪]

এর দ্বারা বোঝা গেল– অনুমোদিত হলেও তালাক যথেচ্ছা ব্যবহারযোগ্য নয়; বরং সমাধানের শেষ উপায় হিসেবে এটি ব্যবহারযোগ্য।

বিয়ে টিকিয়ে রাখতে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য বন্টন করে দিয়েছে। সম্পর্কের মাধুর্য ধরে রাখতে সুস্পষ্ট আচরণবিধি ও উত্তম আখলাকের শিক্ষা দান করেছে। বিশেষভাবে স্বামীদেরকে বলেছে স্ত্রীদের প্রতি সহিষ্ণু হতে, যাতে কোনওক্রমেই সম্পর্ক বিচ্ছেদের বা তালাকের পর্যায়ে না পৌঁছে। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَا زال جبريل يُوصِينِي بِالنِّسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُحَرِّمُ طَلَاقَهُنَّ.

[৭৪] সুনানে আবু দাউদ : ২১৭৮

> জিবরীল আমাকে স্ত্রীদের প্রতি সদাচারের নির্দেশনা দিতেই থাকলেন, অনন্তর আমার মনে হলো তিনি অচিরেই তাদেরকে তালাক প্রদান হারাম করে দেবেন।[৭৫]

সুতরাং তালাকের প্রয়োগ হবে নিরুপায় অবস্থায়। এর আগে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। পারিবারিকভাবে মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষের সালিস নির্ধারণ করা হবে। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন মীমাংসা করতে। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে–

وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِه وَ حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

> তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ সৃষ্টির আশঙ্কা কর, তবে (তাদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য) পুরুষের পরিবার হতে একজন সালিস ও নারীর পরিবার হতে একজন সালিস পাঠিয়ে দেবে। তারা দু'জন যদি মীমাংসা করতে চায়, তবে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত এবং সর্ববিষয়ে অবহিত।[৭৬]

তালাক যেন যথোপযুক্ত কারণে হয় এবং যথাসময়ে হয় সেজন্য ইসলামে রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। যেমন স্ত্রী যখন পাক তথা ঋতুচক্রমুক্ত থাকবে তখন তালাক দেওয়া যাবে। কেননা ঋতুচক্রের সময় স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নেই, যা ভালোবাসা সৃষ্টির কারণ। সুতরাং ইসলাম এমন সময় তালাক প্রদানের অনুমতি দিয়েছে, যখন উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টির সুযোগ থাকে। সেই সুযোগ থাকাবস্থায়ও যদি তালাকের প্রয়োজন বোধ হয়, তার মানে হলো তালাক স্বেচ্ছাচার তাড়িত নয়; বরং বাস্তবিকই প্রয়োজন। সুতরাং এখন তালাক দেওয়া যেতে পারে। তবে তালাক প্রদানের সিদ্ধান্ত যেন সুচিন্তিত ও সুস্থিরভাবে নেওয়া হয়, সেজন্য একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এক পবিত্রাবস্থায় একটিমাত্র তালাক দেওয়া যাবে, একাধিক নয়। যার ফলে পুনর্বিবেচনার সুযোগ

---

[৭৫] আল-মাতালিবুল আলিয়া : ১৬৭৬

[৭৬] সূরা নিসা : ৩৫

থাকে এবং পুনরায় বৈবাহিক সম্পর্কে ফিরে আসা যায়। তাছাড়া এভাবে সময়ক্ষেপণ করে তালাক প্রদানের দ্বারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পুনর্বিবেচনার সময় পায়, শোধরানোর এবং প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ লাভ করে।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন আসতে পারে, তালাকের অধিকার শুধু পুরুষের কেন? নারীকে কেন তা থেকে বঞ্চিত করা হলো?

আসলে প্রশ্নটিই কিছুটা অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। তালাক মূলত বিবাহ বিচ্ছেদের একটি প্রক্রিয়া। বিবাহ বিচ্ছেদের আরও প্রক্রিয়া আছে, যেমন খুলা, ফাসখ ইত্যাদি। নারী যদি বিচ্ছেদের প্রয়োজন অনুভব করে তবে সে খুলা করতে পারে। অনন্যোপায় হলে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে ফাসখ করিয়ে নিতে পারে। সুতরাং বিচ্ছেদের কোনও না কোনও অধিকার কিন্তু নারীর আছে। তবে তালাকের অধিকার নারীকে না দেওয়াটা খুবই যৌক্তিক।

তালাকের অধিকার পুরুষকে দেওয়া হয়েছে আর্থিক ও সামাজিক দায়িত্ব কাঠামো থেকে। কেননা স্বামী হলো পরিবার প্রধান। তার উপর পরিবারের ভরণপোষণ, খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব থাকে। পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের পুরোটা দায়িত্ব তারই উপর। সে হিসেবে তালাকের অধিকারও তাকেই দেওয়া হয়েছে, যেহেতু তালাকদাতার উপর তালাক পরবর্তী নির্দিষ্ট একটা সময় তালাকপ্রাপ্তার ভরণপোষণের দায়িত্বও বর্তায়।

তাছাড়া বিবাহ এক আজীবন মেয়াদী স্থায়ী চুক্তি। এ চুক্তি ভেঙে যাওয়াটা কাম্য নয়। তা ভেঙে যাওয়াটা শয়তানের সবচেয়ে বড় কামনার বস্তু। ইসলাম সর্বপ্রযত্নে এটা রক্ষা করতে চায়। তাই এটা হালাল করা হলেও নিকৃষ্টতম হালাল গণ্য করা হয়েছে, যাতে নিতান্ত ঠেকা না হলে এর প্রয়োগ না হয়। এ লক্ষ্যেও তালাকের ক্ষমতা স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করা হয়নি। কেননা নারীরা এমনিতেই আবেগপ্রবণ। মাতৃত্বের মতো নরম-কোমল মন দিয়েই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এরূপ চরিত্রের সঙ্গে তালাক বড় বেমানান। পুরুষের মতো নারীকেও যদি তালাক প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হতো, তবে পরিবারগুলো খুব সহজেই ভেঙে পড়ত, সমাজব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে যেত।

যে সমাজে নারীকে ডিভোর্সের তথা আদালতের মাধ্যমে একচেটিয়া বিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেখানকার একটি চিত্র তুলে ধরি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ষাট থেকে সত্তর পার্সেন্ট ডিভোর্স নারী শুরু করেন, বিশেষত নো ফল্ট আইন চালুর পর থেকে। রেডিট ব্যবহারকারীদের মতে চীনে ২০১৬-১৭ সনে প্রায় ৭৪ পার্সেন্ট ডিভোর্সের আবেদন স্ত্রীদের দ্বারা করা হয়েছিল।

কেউ কি এ কথা বলবে যে, এসকল ক্ষেত্রে পুরুষরাই দায়ী, পুরুষদের নির্যাতনের কারণেই নিরুপায় হয়ে স্ত্রীরা ডিভোর্সের পথ বেছে নিয়েছে? স্বামী কর্তৃক নির্যাতন বা স্ত্রীর প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া এগুলো নিশ্চয়ই কিছু কারণ। তবে সন্দেহ নেই, ডিভোর্সের সংখ্যা বাড়ার মূল কারণ এগুলো নয়। নিউ ইয়র্ক টাইমস ২৮ জানুয়ারী ২০২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নিউজের হেডলাইন হলো– নারীদের চেয়ে পুরুষরা বিচ্ছেদে মানসিকভাবে বেশি বিপর্যস্ত হন। এ কারণেই নারীরা সাধারণত বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করে থাকে।

১৩ মে ২০২২-এ বিবিসির নিউজ অনুযায়ী নারীরা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা লাভ করতে বিচ্ছেদ কামনা করে থাকেন।

সাইকোস্যোশাল রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালিস্ট বা মানসিক-সামাজিক পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ কেন্দ্রা চেরির ভাষ্যমতে, নারীরা তাদের স্বাস্থ্যের আশংকায় ও ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে গৃহস্থালী কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত হতে চাইছে এবং ডিভোর্সের প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। সূত্র: ভেরিওয়েল মাইন্ড.কম।

আপনি শুধু নো ফল্ট আইনের কথাই ভাবুন। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭০-এর দশক থেকে নো ফল্ট আইন কার্যকর। অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ করতে কোনও পক্ষের দোষ বা ভুল প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াই আদালতের মাধ্যমে বিচ্ছেদ করিয়ে নেওয়া যায়। এর ফলে বিশেষ কোনও কারণ ছাড়াই সম্পর্কগুলো ভেঙে যাচ্ছে, বা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে।

মোটকথা ইসলামে তালাককে স্বামীর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং স্বামী যেন তা ব্যবহারে স্বেচ্ছাচারী না হয় সেজন্যও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّ لَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا

> যখন তোমরা নারীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, তারপর তারা তাদের ইদ্দতের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন হয় তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে (নিজ স্ত্রীত্বে) রেখে দেবে, নয়ত তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে ছেড়ে দেবে। তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার লক্ষ্যে এজন্য আটকে রেখ না যে, তাদের প্রতি জুলুম করতে পারবে।[৭৭]

জাহিলী যুগে একটা নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা এই ছিল যে, লোকে তাদের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিত, তারপর যখন ইদ্দত শেষ হওয়ার উপক্রম করত তখন প্রত্যাহার করে নিত, যাতে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে না পারে। তারপর তার হক আদায়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বরং কিছুদিনের ভেতর আবারও তালাক দিত এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে-আগে প্রত্যাহার করে নিত। এভাবে সে বেচারী মাঝখানে ঝুলে থাকত, না অন্য কোনও স্বামী গ্রহণ করতে পারত আর না বর্তমান স্বামীর কাছ থেকে নিজ অধিকার আদায় করতে পারত। আলোচ্য আয়াত তাদের সে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাকে হারাম ঘোষণা করছে।

তালাকের জাহিলী যুগের অপব্যবহার বর্তমানেও লক্ষ্য করা যায়। বরং এর রূপ ও ধরণ আরও বেড়েছে। ছোটখাটো ভুলের কারণে বা সামান্য অসন্তুষ্টিতেই তালাক দিয়ে দেওয়া, রাগের মাথায় কিছু না ভেবেই তালাক দেওয়া ইত্যাদি তো আছেই, অনেক পুরুষ আবার বহুবিবাহের অজুহাতে বর্তমান স্ত্রীকে তালাক দিতে উদ্যত হয়। অনেক সময় পরিবারের চাপে নির্দোষ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। শাশুড়ি অকারণে কিংবা ক্ষুদ্র কারণে পুত্রবধুর উপর চটে যায় এবং পুত্রের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে

[৭৭] সূরা বাকারা : ২৩১

যেন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। সে বেচারাও এটাকে মায়ের আনুগত্য হিসেবে বিবেচনা করে তা পালন করে। বিখ্যাত তাবিঈ হাসান বসরী রহ.কে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো– কাউকে যদি তার মা বলে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে সে কী করবে? তিনি জবাব দিলেন– তালাক প্রদান মায়ের আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৭৮] অনুরূপ প্রশ্ন আতা রহ.-কে করা হলে তিনি স্পষ্ট বলেন– এমনিতে মায়ের অনুগত থাকবে, তবে স্ত্রীকে তালাক দেবে না।[৭৯]

তালাককে হুমকি হিসেবে ব্যবহার করে স্ত্রীর উপর মানসিক টর্চার নারী নির্যাতনের এক ভয়াবহ চিত্র। স্বামী তার অনায্য দাবি বাস্তবায়নের জন্য কিংবা তার অন্যায় সয়ে যাওয়ার জন্য স্ত্রীকে বারবার হুমকি দিতে থাকে– তোমাকে তালাক দিয়ে দেব কিন্তু। বেচারী স্ত্রী নিজেকে নিরূপায় ভেবে চুপ করে যায়, আপন অসহায়ত্বে দগ্ধ হতে থাকে।



[৭৮] আল-বির ওয়াস সিলাহ : ৫৯

[৭৯] আল-বির ওয়াস সিলাহ : ৫৮

পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন

নারীর প্রতি নির্যাতনের এক বিশাল শাখা পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন। পরিবার ও সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী, ভুল রীতি-নীতি, সামাজিকভাবে নারীকে অবমূল্যায়ন ইত্যাদি সামাজিক নির্যাতনের নিয়ামক।

আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে মনে করা হয়, নারীরই দায়িত্ব পরকে আপন করে নেওয়া, স্ত্রীরই কর্তব্য স্বামীর মন-মেজায বোঝা। আমাদের সমাজে মনে করা হয়– বিয়ের পর স্বামী, শশুরবাড়ি বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার দায়িত্ব একমাত্র নারীর। পুরুষের এক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা নেই, বা ভূমিকা রাখার দরকার নেই। পুরুষ যতই ভুল করুক, যতই অবহেলা করুক, সমাজ নারীকে বলে– তুমি মানিয়ে নাও, তুমি সহ্য করো, তুমি পরকে আপন করো। এভাবে নারীর উপর একতরফা দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে সামাজিকভাবেই নারীকে নির্যাতনের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। এর ফলে নারীর আত্মসম্মান ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি ক্ষুণ্ন হয়, নারীর প্রতি অবিচারকে স্বাভাবিক মনে করা হয়, অপরদিকে নারী সব মুখ বুজে সহ্য করে, কারণ অন্যথায় সমাজ তাকেই দোষী মনে করে। ইসলামী ভাবধারার সঙ্গে এটি মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ইসলাম স্বামীদের আদেশ করেছে–

عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তমভাবে জীবনযাপন করো।[৮০]

এখানে স্বামীদের বলা হয়েছে স্ত্রীকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করতে, তার জীবনকে শান্তিময় করতে।

---

[৮০] সূরা নিসা : ১৯

কন্যা সন্তান ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী

এখনও অনেক সমাজে কন্যাসন্তান সম্পর্কিত জাহিলী চিন্তা-ভাবনা বিদ্যমান। মেয়ে জন্ম নেওয়ায় অখুশী হওয়া, বেশি মেয়ে হলে বিরক্তি প্রকাশ করা, লোকলজ্জার ভয় করা ইত্যাদি। ইসলামপূর্ব যুগে এরূপ ধ্যান-ধারণার প্রচলন ছিল। ইসলাম এসে এগুলো মূলোৎপাটন করেছে। পবিত্র কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُه مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِه اَيُمْسِكُه عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّه فِى التُّرَابِ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

> যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান (জন্মগ্রহণ)-এর সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে মনে মনে দুঃখ-ক্লিষ্ট হয়।
>
> সে এ সুসংবাদকে খারাপ মনে করে মানুষ থেকে লুকিয়ে বেড়ায় (এবং চিন্তা করে), হীনতা স্বীকার করে তাকে নিজের কাছে রেখে দেবে, নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। জেনে রেখো, তারা যে সিদ্ধান্ত স্থির করে তা অতি মন্দ![৮১]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শব্দ ব্যবহার করেছেন بُشِّرَ (সুসংবাদ দেওয়া হয়)। ইশারা হচ্ছে, পুত্র সন্তানের খবর যেমন সুখবর, কন্যা সন্তানেরও তাই। পুত্র সন্তান হলে সুসংবাদ আর কন্যা সন্তান হলে দুঃসংবাদ, এটা অমানবিক ও অনৈসলামিক ভাবনা–দুটোই সুসংবাদ এবং দুই'ই আল্লাহর দান। কাজেই সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা সর্বাবস্থায়ই তার জন্ম সংবাদকে খুশিমনে গ্রহণকরত আল্লাহ তা'আলার শুকর আদায়ে রত হতে হবে। এটাই কুরআনের শিক্ষা এবং জগদ্বাসীকে সবার আগে কুরআনই এ শিক্ষা দান করেছে।

কিন্তু বর্তমানের বহু সমাজ কুরআনের এ শিক্ষা থেকে যোজন যোজন দূরে। তারা কন্যাসন্তানের জন্মে অখুশী তো হয়ই, অধিকন্তু এ জন্য তারা মা'কেই দায়ী করে। স্বামী ও তার পরিবারের লোকেরা স্ত্রীর সঙ্গে এমন

[৮১] সূরা নাহল : ৫৮,৫৯

আচরণ করে মনে হয় যেন, সন্তানকে সে-ই বেছে নিয়েছে। পুত্র না কন্যা হবে এটা স্ত্রীরই সিদ্ধান্ত। অথচ আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলছেন–

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّه عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন।

অথবা পুত্র ও কন্যা উভয় মিলিয়ে দেন। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।[৮২]

আয়াতটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ জানান, কাকে সন্তান দেওয়া হবে, আর কাকে দেওয়া হবে না এটা তাঁরই ইচ্ছা। কাকে কোনটা দেওয়া হবে, ছেলে না মেয়ে, সে ফয়সালাও কেবল তাঁরই। সন্তান হওয়া না হওয়া সম্পর্কে মানুষের নিজস্ব কোনও সিদ্ধান্ত কার্যকর নয়। তিনি না চাইলে কারও পক্ষেই সন্তানলাভ সম্ভব নয়। তিনিই জানেন কার জন্য কোনটা কল্যাণকর। তিনি নিজের সেই জ্ঞান অনুযায়ীই ফয়সালা নিয়ে থাকেন। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ.

আল্লাহ সৃষ্টিজগতের ভাগ্য লিখে রেখেছেন আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই।[৮৩]

সুতরাং কন্যাসন্তান জন্মানোর দায় তার মায়ের উপর চাপানো নিতান্তই মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আমাদের সমাজে এটা কেবল মূর্খতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর ভিত্তিতে মায়েদের উপর চলে মানসিক নির্যাতনের বহর। কথায় কথায় শশুর-শাশুড়ি বলে– আমাদের বংশের বাতি তো জ্বালাইতে

[৮২] সূরা শূরা : ৪৯,৫০

[৮৩] সহীহ মুসলিম : ২৬৫৩

পারলা না, ঘরে কোনও সুখ আনতে পারলা না, মেয়ে জন্ম দিয়ে আমাদের মুখ কালো করলে, ফের মেয়ে বাচ্চা জন্মালে আমরা আমাদের ছেলেকে আবার বিয়ে করাব ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়াও কন্যাসন্তানের মাকে পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে উপেক্ষা করা হয়, তাকে অতিরিক্ত কাজের চাপ দেওয়া হয়, কখনও কখনও স্বামীকে প্রভাবিত করে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ানোর চেষ্টা করা হয়, সর্বোপরি কন্যাসন্তান জন্মানোকে অভিশাপ বা বোঝা হিসেবে দেখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে তো দাদা দাদি নাতনির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন। অথচ ইরশাদ হয়েছে–

﴿فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا﴾

এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে, তোমরা কোনও জিনিসকে অপছন্দ করছ, অথচ আল্লাহ তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।[৮৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا تُكْرِهُوا الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ.

তোমরা কন্যা সন্তান অপসন্দ করো না। নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গ আনন্দদায়ী এবং তারা অনেক দামী।[৮৫]

কাজেই কন্যা সন্তান হওয়া তো সৌভাগ্যের কথা! ইয়াকূব ইবনে বুখতান রহ. নামে এক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন– আমার সাত সাতজন কন্যাসন্তান হলো। প্রতিবার যখন আমার মেয়ে হত, আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে যেতাম। তিনি আমাকে দেখলেই বলতেন– আবূ ইউসুফ! আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সাধারণত কন্যাসন্তানের পিতা হতেন।[৮৬]

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

[৮৪] সূরা নিসা : ১৯

[৮৫] মুসনাদে আহমাদ : ১৭৩৭৩; তবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর : ৮৫৬।

[৮৬] তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ৩১

যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণ করে, এমনকি তারা প্রাপ্তবয়সেও পৌঁছে যায়, কেয়ামতের দিন আমি ও সেই ব্যক্তি এভাবে একসাথে থাকব। এই বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।[৮৭]

নারীশিক্ষা

পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নারী নির্যাতনের আলোচনায় বিশেষভাবে নারীশিক্ষার বিষয়টি উল্লেখ্য। অনেক পরিবারে এখনও মনে করা হয়, কন্যাশিশুর পড়াশোনার প্রয়োজন নেই।

অথচ শিক্ষা সবার জন্যই। পুরুষ-নারী উভয়ের জন্যই ইসলাম শিক্ষাকে ফরজ করেছে। ইরশাদ হয়েছে–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ইলম অন্বেষণ ফরজ।[৮৮]

এখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয়নি। পবিত্র কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

বলো, যারা জানে আর যারা জানে না উভয়ে কি সমান?[৮৯]

এ আয়াত নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। মোটকথা শিক্ষার প্রতি ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এতে নারীকে বঞ্চিত করার কোনও সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে স্বতন্ত্রভাবে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।[৯০] ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়– ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে আমাদের মায়েদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. ছিলেন শরীয়তের ইলমের এক বিশাল ভাণ্ডার। হাজারও নারী-পুরুষ তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

---

[৮৭] সহীহ মুসলিম : ২৬৩১

[৮৮] সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২৪

[৮৯] সূরা যুমার : ০৯

[৯০] সহীহ বুখারী : ৯৮

উম্মাহাতুল মুমিনীনদের সকলেই ছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রে একেকটা উজ্জ্বল নক্ষত্র। শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ রাযি. ছিলেন একজন নামকড়া ডাক্তার। ছিলেন শিক্ষিকাও। মদীনা মুনাওয়ারায় নারীদের শিক্ষাকার্যে তাঁর ছিল বিশেষ অবদান। এছাড়াও হাদীছের কিতাবাদিতে হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে নারীদের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে চোখে পড়ে। সে যুগে নারীদের শিক্ষাগ্রহণে ব্যাপক অংশগ্রহণ ও স্বত:স্ফূর্তা দেখে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বলেছিলেন–

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنِ الدِّينِ، وَأَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِيهِ.

> আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! দীনী বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে ও জ্ঞান-গভীরতা অর্জনে লজ্জা তাদের জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না।[৯১]

ইসলামের ইতিহাসে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অবদান অতুলনীয়। প্রত্যেক যুগেই এর প্রমাণ দেদীপ্যমান। যেমন উমরা বিনতে আব্দুর রহমান ছিলেন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর হাতেগড়া ছাত্রী এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিছ যুহরী রহ.-এর উস্তাযা। ফাতেমা বিনতে সাদ আল-খায়র দূর-দূরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে ইলম অর্জন করেছিলেন। তাঁর এক শিক্ষিকার নাম ছিল ফাতেমা বিনতে আব্দুল্লাহ। আয়েশা বিনতে মুহাম্মাদ আল-হাররানিয়া রহ.-এর মজলিসে উপস্থিত হতেন তাঁর যুগের বড় বড় উলামায়ে কেরাম। তাকিউদ্দীন সুবকী রহ. ইলম হাসিল করেছেন যায়নাব বিনতে সুলায়মান ইবনে ইবরাহীম রহ.-এর কাছ থেকে। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর এক উস্তাযার নাম যায়নাব বিনতে আব্দুল্লাহ রহ.। ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আস-সামারকান্দী রহ. ছিলেন বহুগ্রন্থ রচয়িতা। সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ রাষ্ট্রীয় নানা বিষয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. যার কাছে নাহু শাস্ত্র শিখেছিলেন তিনি হলেন উম্মে হানী রহ.। এরকম শত শত নাম উপস্থাপন করা যাবে।

---

[৯১] সুনানে আবু দাউদ : ৩১৬

সুতরাং নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠা ও এর সুফল বিস্তারে ইসলাম অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুত নারী শিক্ষা সমাজের সর্বপ্রকার উন্নয়নে গভীর ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষিত নারী ঘরে ও সমাজে সঠিক শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে পারে। যিনি বলেছেন, যথার্থই বলেছেন–

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق

মা তো এক বিদ্যালয়। যদি তুমি তাকে সেভাবে গড়তে পারো,
তবে যেন এক সভ্য সমাজ বিনির্মাণ করলে।

সামাজিকভাবে নারীর প্রতি নির্যাতনের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হলো নির্যাতনের শিকার নারীকে সমাজ দয়া ও সহমর্মিতার বদলে দোষী বা অপয়া হিসেবে বিবেচনা করে। সামাজিকভাবে তাকে বিচ্ছিন্ন বা একঘরে করে দেওয়া হয়। তাকে আইনি সহায়ত নিতে বাধাদান করা হয়। তার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকরণকেও দোষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ধর্ষিতা নারীর পুনর্বিবাহ তো আজকালকার সমাজে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগুলো বড় কঠিন বাস্তবতা, যা আমাদের ব্যাপক নৈতিক অবক্ষয়ের স্বাক্ষ্য দেয়।



অর্থনৈতিক নির্যাতন

নারীর প্রতি অর্থনৈতিক নির্যাতন এক চরম বাস্তবতা। নারীর আয়, সম্পদ, তথা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ঘিরেই আবর্তিত হয় অর্থনৈতিক নির্যাতন। নারীকে তার বৈধ উপার্জনে বাধা দেওয়া হয়, তার উপার্জিত সম্পদে অন্যায় দখলদারি করা হয়, তার সম্পদ ভোগে অযাচিত নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তার শ্রম নানাভাবে শোষিত হয়– ইত্যাদি সবই অধুনা সমাজের নিত্যদিনের চিত্র।

ইসলাম নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা দিয়েছে। তা এমন এক সময় যখন তারা সর্বপ্রকার আর্থিক মালিকানা থেকে বঞ্চিত ছিল। বরং নারী নিজেই স্বামীর সম্পত্তিরূপে গণ্য হতো। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীর সম্পদে অন্যের কর্তৃত্বের অবসান ঘটায় এবং নারীদের বৈধ উপায়ে সম্পদের মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার নিশ্চিত করে।

ইসলাম পুরুষের জন্য নারীর সম্পদ আত্মসাৎ করা অবৈধ সাব্যস্ত করেছে, যদি না নারী স্বেচ্ছায় তা দেয়। এমনকি নারী ধনী হলেও। ইসলামে নারীর সম্পদের মালিকানা, ভোগ-উপভোগ ও ব্যবহারের অধিকার আছে। তার একটি পৃথক আর্থিক সত্তা আছে, যেখানে স্বামী বা অভিভাবক হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ইতঃপূর্বে সম্পদের অধিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নারীকে উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা

নারীর প্রতি অর্থনৈতিক নির্যাতনের এক বিভীষিকাময় অধ্যায় হলো উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা। এটা ছিল ইসলামপূর্ব যুগের অবস্থা। ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকার সম্পদে ন্যায্য অধিকার দান করেছে। এ সম্পর্কে সূরা নিসাতে আল্লাহ তা'আলা বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

পুরুষদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায় আর নারীদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায়, চাই সে (পরিত্যক্ত) সম্পদ কম হোক বা বেশি। এ অংশ (আল্লাহর তরফ থেকে) নির্ধারিত।[৯২]

হযরত উমর রাযি. বলেন–

وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ.

আল্লাহর কসম! আমরা জাহিলী যুগে নারীদের কিছুই দিতাম না; অনন্তর আল্লাহ তাদের সম্পর্কে যা নাযিল করার করলেন এবং তাদের জন্য যা বন্টন করার তা করলেন।[৯৩]

জাহিলী যুগের এ চিত্র বর্তমানেও ব্যাপক। অনেক পিতাও তার কন্যাকে বঞ্চিত করে। ছেলের নামে সম্পদ কেনে, মেয়ের নামে নয়। অনেক পিতা মৃত্যুর আগে সবটা সম্পদ ছেলেদের লিখে দেয়। কোনও কোনও মাও মৃত্যুর আগে তার সম্পদ ছেলেদের দিয়ে যায়। তারপর মীরাছী সম্পত্তিতে সামান্য যা অবশিষ্ট থাকে ভাইয়েরা তাতেও বোনদের ঠকায়, তার সম্পত্তি দখল করে নেয়। বোনকে বলে– তুমি তো স্বামীর ঘরে চলে গেছ, তোমার আর কোনও অধিকার নেই। কিংবা বলে তোমার বিয়েতে আমরা অনেক দিয়েছি, এখন আর তোমার পাওয়ার কিছু নেই। কোনও মেয়ে যদি একমাত্র উত্তরাধিকারী হয় তবে চাচারা প্রভাব খাটিয়ে তার সব দখল করে নেয় বা নামেমাত্র কিছু দিয়ে তাকে প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করে। অথচ এক হাদীছে উত্তরাধিকারীকে তার প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিতকারীকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।[৯৪]

[৯২] সূরা নিসা : ০৭

[৯৩] সহীহ বুখারী : ৪৯১৩

[৯৪] সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৭০৩

অনেকে নামেমাত্র টাকাপয়সা দিয়ে বোনের প্রাপ্য স্থাবর সম্পত্তি কব্জা করে নেয়। কিংবা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তার কাছ থেকে সামান্য বিনিময়ে সব হাতিয়ে নেয়।

পারিবারিক কলহের ভয়ে বোনেরা কিছু বলেও না। অনেক সময় তো পরিবার থেকে সুস্পষ্ট হুমকিও দেওয়া হয় যে, অধিকার চাইলে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। এভাবেই নারীকে অর্থনৈতিকভাবে নির্যাতন করা হয়।

যৌতুকের জন্য চাপ দেওয়া

নারীর প্রতি অর্থনৈতিক নিপীড়ণের আরেক খড়্গ হলো যৌতুক। আমাদের সমাজ আজও পর্যন্ত যৌতুকের বিষবাষ্প থেকে মুক্ত হতে পারেনি। যদি বলা হয়– ব্যক্তিজীবনে আমরা মুসলিম বটে, কিন্তু আমাদের সমাজটা আজও পর্যন্ত মুসলিম হয়ে ওঠেনি, তবে মোটেই অসত্য বলা হবে না। নানারকম অনৈসলামি ভাবধারা সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। ইসলাম যাকিছু অবৈধ করেছে, তার অনেককিছুই সমাজে জোরেশোরে চালু রয়েছে। যৌতুকও তার একটা। এর যূপকাষ্ঠে হাজারও নারীর জীবন সাঙ্গ হচ্ছে। স্বামী ও শশুরালয়ের লোকজন নিত্যদিন বউকে যৌতুক নিয়ে কথা শোনাতে থাকে– তোমার বাবা এই দেয়নি, সেই দেয়নি, আরও কত কী! এইবার যদি বাপের বাড়ি থেকে এসব নিয়ে না আস, তবে তোমার বাবার সঙ্গে আমাদের শেষ বোঝাপড়া হবে। বহু পরিবারে বউকে যৌতুকের জন্য বাপের বাড়ি ফেলে রাখে। চাহিদা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে নেওয়ার নাম করে না। নিলেও মুখের বিষ বমন তো আছেই, হাত তুলতেও দ্বিধাবোধ করে না। স্বামী, শশুর-শাশুড়ি, দেবর, ভাসুর, ননদ সবাই মিলে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। মেরে আহত করে। অগ্নিদগ্ধ করে। এমনকি হত্যা পর্যন্ত করে।

ঢাকা ট্রিবিউন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত (০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২) একটি প্রতিবেদনের বর্ণনা অনুযায়ী বাংলাদেশে নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত মোট সহিংসতার প্রায় ৫০ শতাংশ যৌতুকের কারণে ঘটে। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী আদালতের নথি থেকে জানা যায়– ২০০২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সতেরো বছরে শুধুমাত্র রাজধানীতে যৌতুকের কারণে ৩৭৪ জন নারীকে হত্যা করা হয়েছে। গড়ে প্রতি বছর ঢাকায় ২২ জন

নারী যৌতুকের কারণে নিহত হন। এ ফিরিস্তি অনেক লম্বা। কোনও কোনও মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারী ২০০১ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত যৌতুক সংশ্লিষ্ট নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৫৮০০-এরও বেশি।

মোহর বঞ্চিত করা

মোহর স্ত্রীর নিজস্ব অধিকার। এটা বিবাহ বৈধ হওয়ারও শর্ত। কিন্তু বহু স্বামী স্ত্রীকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। হয়ত মোহরের অর্থ আদৌ পরিশোধ করে না। আবার অনেকে পরিশোধ করলেও তা স্বাধীনমতো ভোগ করতে দেয় না। পরিশোধ করার পর আবার তা ফেরত নিয়ে নেয়। নানা বাহানায় ফেরত নেয়। পরে আর ফিরিয়ে দেওয়ার নাম করে না।

সমাজে মোহর মাফ করে দেওয়ারও একটা রেওয়াজ আছে। মনে করা হয়– মোহর কেবল লেখার বিষয়; পরিশোধ করা জরুরি নয়। সামাজিক চাপে স্ত্রীও তা মাফ করে দিতে বাধ্য হয়। চাওয়ার হিম্মত করে না। বরং চাওয়াটাকে লজ্জাকর মনে করে। এভাবে স্ত্রীর এ অধিকার হরণ করাটা সামাজিক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। নিঃসন্দেহে নারীর প্রতি এ এক আর্থিক অবিচার।

এতসব আর্থিক অবিচারের কারণে নারী তার অনেক সদিচ্ছা পূরণ করতে পারে না। তা তো পূরণ করতে পারেই না, উল্টো মানসিক বৈকল্যেরও শিকার হয়। হীনম্মন্যতায় ভোগে। বিষণ্নতারও শিকার হয়। তার বড় ইচ্ছা হয় নিজ অর্থ দিয়ে ভাইবোনদের সাহায্য করবে, বাবা-মায়ের খেদমত করবে, আর্তমানবতার সেবা করবে, জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করবে, ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনির আবদার পূরণ করবে, হজ্জ-ওমরাহ করবে, কিন্তু কোনওটাই তার করা হয় না। সব সাধ অপূরণ থেকে যায়। এ কষ্ট তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। এক পর্যায়ে সে নির্জীব জড় পদার্থের মতো আবেগ-অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। যার নিজস্ব কোনও ব্যয় নেই, অথচ আয়ের সুনির্দিষ্ট একাধিক উৎস রয়েছে, তার কেন এ অসহায়ত্ব? একটা মুসলিম সমাজে এটা কিভাবে বাস্তব হতে পারে? কিন্তু যে যতই অনুচিৎ মনে করা হোক না কেন, এটা আজ আমাদের সমাজের এক নিদারুণ বাস্তবতা।

নারীর মর্যাদা

কেন নারীর প্রতি এত সব সহিংসতা? এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। ইসলাম নারীকে কী উচ্চ মর্যাদাই না দিয়েছে। আল্লাহর কাছে পুরুষের যা মর্যাদা, নারীরও তাই। নারী ও পুরুষ দুই-ই মানুষ। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অন্যসব মাখলুকের উপর আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন। বলেছেন–

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

> বাস্তবিকপক্ষে আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও জলে তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমার বহু মাখলুকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।[৯৫]

আয়াতে বলা হয়েছে বনী আদমের কথা। অর্থাৎ হযরত আদম আ. থেকে উদ্ভূত সকল মানুষ, যার মধ্যে নারী পুরুষ উভয়েই রয়েছে। উভয়েই আল্লাহ তা'আলার মর্যাদাবান সৃষ্টি। উভয়ের দ্বারা এ পৃথিবী আবাদ হয়েছে। পৃথিবীর আবাদে নারী মা হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। ভূমিকা রেখেছে স্ত্রী হিসেবেও। মানবসভ্যতার ইতিহাস নির্মাণে আমাদের মায়েরা এবং আমাদের স্ত্রীরা যে অবদান রেখেছে, কোনও মূল্যবোধ সম্পন্ন পুরুষ তা অস্বীকার করতে পারে না। কেননা তা অস্বীকার করা নিজ মর্যাদা অস্বীকার করারই নামান্তর। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.

---

[৯৫] সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০

নারীগণ পুরুষের (অপর) অর্ধাংশ (অর্থাৎ নারী ও পুরুষ মিলে পরিপূর্ণ সত্তা)।[৯৬]

কাজেই যে পুরুষ নিজেকে স্বীকার করবে, সে নারীকে অস্বীকার করতে পারে না। যে পুরুষ নারীকে অমর্যাদা করবে, সে নিজেকেই অমর্যাদা করবে। পুরুষ যাতে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকে, কখনও শক্তিমদমত্ততায় নারীর মর্যাদা ভুলে না যায়, সে লক্ষ্যে আমাদের মহান দীন ইসলাম নানাভাবে আদেশ-উপদেশ দিয়েছে। যেমন কখনও মায়ের মর্যাদা তুলে ধরে ইরশাদ করেছে–

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا حَمَلَتْهُ اُمُّه كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَ حَمْلُه وَ فِصٰلُه ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার হুকুম দিয়েছি। তার মা তাকে অতি কষ্টের সাথে (গর্ভে) ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তাকে (গর্ভে) ধারণ ও দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ হয় ত্রিশ মাস।[৯৭]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোনও একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।[৯৮]

---

[৯৬] জামে' তিরমিযী : ১১৩

[৯৭] সূরা আহকাফ : ১৫

[৯৮] সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩

এক সাহাবি জিহাদে যেতে চাইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– তোমার মা আছেন? উত্তর দিলেন হাঁ আছেন। তিনি বললেন–

فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا.

তবে তার সেবায় নিয়োজিত থাকো, কেননা জান্নাত তার পায়ের কাছে।[৯৯]

আবার কখনও স্ত্রীর মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

দুনিয়া সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী।[১০০]

নেককার স্ত্রী একজন স্বামীর পক্ষে অমূল্য সম্পদ। সে তার অনুপ্রেরণা। তার প্রাণশক্তি। সে তার শরীরের শান্তি, হৃদয়ের স্বস্তি। দীন-দুনিয়ার অগ্রযাত্রায় একজন নেককার স্ত্রী তার স্বামীর উত্তম সহযোগী। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেছিলেন– আমরা কী সম্পদ অর্জন করব? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন–

لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ.

আল্লাহর নাম উচ্চারণকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ মন এবং মুমিনা স্ত্রী, যে তার স্বামীকে ঈমানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে।[১০১]

বস্তুত পুরুষজীবনের জন্য নারীর অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। নারীও পুরুষ ছাড়া অচল, পুরুষও নারী ছাড়া অচল। ইরশাদ হয়েছে–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

---

[৯৯] সুনানে নাসাঈ : ৩১০৪
[১০০] সহীহ মুসলিম : ১৪৬৭
[১০১] জামে' তিরমিযী : ৩০৯৪

> তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাক।[১০২]

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতা, ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্কের বহুমুখী কল্যাণ বোঝানোর জন্য কতই না সুন্দর উপমা। পোশাক যেমন মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজন, পোশাক যেমন মানবদেহের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে, পোশাক যেমন মানুষের সৌন্দর্য বর্ধন করে, তা যেমন শরীরের দোষ-ত্রুটি আড়াল করে রাখে এবং তা যেমন শরীরে আরাম জোগায়, তেমনি স্বামী-স্ত্রীও একে অন্যের পক্ষে সৌন্দর্যবর্ধক। তাদের নিবিড় সম্পর্ক শরীর-মনের জন্য শান্তিদায়ক, দোষ-ত্রুটি আড়ালকারক এবং ধৈর্য, সংযম, সহমর্মিতা প্রভৃতি সদগুণাবলির বিকাশে সহায়ক। সেইসঙ্গে এ উপমা স্বামী-স্ত্রীর মানবিক সাম্য-সমতার প্রতিও ইঙ্গিতবাহী। সুতরাং উভয়ের কর্তব্য এ সম্পর্কের মূল্য উপলব্ধি করা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতাবোধের সঙ্গে দাম্পত্যজীবন নির্বাহ করা।

আসলে মানবীয় মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমান। পুরুষের যা অভিভাবকত্ব তা কেবলই দুনিয়ার নিয়ম-শৃঙ্খলা হিসেবে। অভিভাবকত্ব দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কাছে মর্যাদা নিরুপিত হয় না। বান্দা হিসেবে মানুষের কাজ আল্লাহ তা'আলার কাছে মর্যাদা পাওয়ার চেষ্টা করা। তা পুরুষ হোক বা নারী। সে মর্যাদা লাভ হয় কেবলই আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন দ্বারা। শরীয়তের পরিভাষায় যাকে তাকওয়া বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ

> প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী।[১০৩]

মুত্তাকীর কাজ আল্লাহ তা'আলা যা কিছু আদেশ করেছেন তা মেনে চলা আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকা। যে নারী বা পুরুষ এ নীতি অনুযায়ী চলবে, সেই আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভ করবে।

---

[১০২] সূরা বাকারা : ১৮৭

[১০৩] সূরা হুজুরাত : ১৩

আখেরাতে জান্নাতের অধিকারী হবে। ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيٰوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

যে ব্যক্তিই মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাব এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করব।[১০৪]

সারকথা, মানবীয় মর্যাদায় নারী-পুরুষের কোনও ভেদাভেদ নেই। মানবসভ্যতার কল্যাণসাধনেও তাদের প্রত্যেকে অন্যের সহযোগী। প্রত্যেকেরই শরীয়তনির্ধারিত হক আছে এবং আল্লাহপ্রদত্ত মর্যাদা আছে। সে হক ও সে মর্যাদা ঈমানের সঙ্গে গাঁথা। যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বলে দাবি করে, তার দ্বারা সে হক লঙ্ঘিত হওয়ার কথা নয় এবং কথা নয় সে মর্যাদা অস্বীকার করারও। কিন্তু আমরা উপরে দেখলাম এর বিপরীত চিত্র, যা একটা মুসলিম সমাজের সঙ্গে কিছুতেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমাদেরকে এর থেকে মুক্তি পেতে হবে। নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা আমাদের দিতে হবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার সে আদেশ আমাদের করেছেন। তিনি হুকুম করেন–

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

তোমরা নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ গ্রহণ করো।[১০৫]

বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন–

اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ.

তোমরা নারীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো, কেননা আল্লাহর দেওয়া নিরাপত্তার সঙ্গে তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ।[১০৬]

---

[১০৪] সূরা নাহল : ৯৭

[১০৫] সহীহ বুখারী : ৫১৮৫

[১০৬] সহীহ মুসলিম : ১২১৮

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও নারীনির্যাতন রোধে আমাদের করণীয়

যে সকল কারণে নারীর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয় এবং তাদের অধিকার হরণ করা হয়, তার মধ্যে একটি হলো ব্যাপক অজ্ঞতা। অধিকাংশ মানুষই নারীর মর্যাদা জানে না। নারীর অধিকার সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ। যে ব্যক্তি জানেই না নারীর কী মর্যাদা, সে নারীকে মর্যাদা দেবে কীভাবে? এমনিভাবে যে ব্যক্তি নারীর অধিকার সম্পর্কেও অজ্ঞ, তার দ্বারা নারীর অধিকার আদায়ের আশা কতুটুকু যৌক্তিক? তাই সময়ের দাবি হলো এ বিষয়ে মানুষের অজ্ঞতা দূর করার প্রচেষ্টা চালানো। মানুষ যদি নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে, তবে নারী সম্পর্কে তাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীও গড়ে ওঠবে। তারা বুঝতে পারবে–

* পুরুষের মতোই নারীরাও আল্লাহ তা'আলার কাছে মর্যাদাবান। নারী ও পুরুষ উভয়েই মানুষ এবং মানুষ হিসেবে উভয়েই শ্রেষ্ঠ মাখলুক। তাদের কাউকে অমর্যাদা করা যায় না।

* নারীমাত্রই মা। স্বামীর বেলায়ও সে তার সন্তানের মা। মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।

* স্ত্রী স্বামীর সম্পূরক। হাদীছে বলা হয়েছে–

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمُلَ نِصْفُ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.

যে ব্যক্তি বিবাহ করেছে, তার দীনের অর্ধেক পূর্ণ হয়ে গেছে। বাকি অর্ধেকের জন্য সে আল্লাহকে ভয় করুক।[১০৭]

* পুরুষের মতো নারীরও সুনির্দিষ্ট হক আছে। সে হক নষ্ট করা যায় না।

* অধীন হওয়াটা নারীর ক্ষুদ্রতা নয়; বরং তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।

[১০৭] বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান : ৫১০০

* পুরুষের অভিভাবকত্ব কর্তৃত্বপরায়ণতার জন্য নয়; বরং দায়িত্বশীলতার জন্য।

এই জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপক বিস্তার দরকার। শুরুটা করতে হবে পরিবার থেকেই। পরিবারকে হতে হবে পাঠশালা। ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের এ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গড়ে তুলতে হবে। ছেলেমেয়েদের দিতে হবে সমান সুযোগ-সুবিধা এবং সমান মর্যাদা ও ভালোবাসা।

তারপর সামাজিকভাবে এ জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। সে লক্ষ্যে প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। কাজে লাগাতে হবে শিক্ষাঙ্গনকে, মসজিদকে এবং জনসমাগমের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে। এজন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে, যাতে তারা তাদের শিক্ষার্থীদের ভেতর এ জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হয়।

মসজিদের ইমামগণকেও এ বিষয়ে সচেতন করা দরকার, যাতে জুমুআর খুতবায় তারা মানুষের সামনে এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেন। ওয়াজ-মাহফিলের আলোচনার জন্য এটা একটি স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু হতে পারে। এ লক্ষ্যে আয়োজন করা যেতে পারে স্বতন্ত্র আলোচনা সভা ও সেমিনারের।

দাওয়াত ও প্রচারণার একটি বড় মাধ্যম লেখালেখি। তাই এ বিষয়ের উপর ছোট-বড় বই-পুস্তক লেখা ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা যেতে পারে। এর জন্য অফলাইনে সীমাবদ্ধ না থেকে অনলাইনকেও কাজে লাগানো যেতে পারে; বরং বর্তমানকালে অনলাইন সর্বাপেক্ষা সমাদৃত প্রচারমাধ্যম। তাই এ মাধ্যমকেই বেশি কাজে লাগাতে হবে।

আসলে এর জন্যে প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত চেষ্টা থাকা দরকার। প্রত্যেকে যদি নারীর মর্যাদা ও নারীর অধিকারকে ব্যক্তিগত দাওয়াতের বিষয়বস্তু বানিয়ে নেয়, তবে ঘরে-বাইরে সর্বত্র সর্বদা এর প্রচার অব্যাহত থাকবে।

মানুষ যদি এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে পারে, আর সে জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে, তবে তাকওয়া বা আল্লাহভীতির চর্চাও হবে সঠিকভাবে। আল্লাহভীতির চর্চা ছাড়া কোনও ভালো উদ্যোগে সফলতা আসতে পারে না।

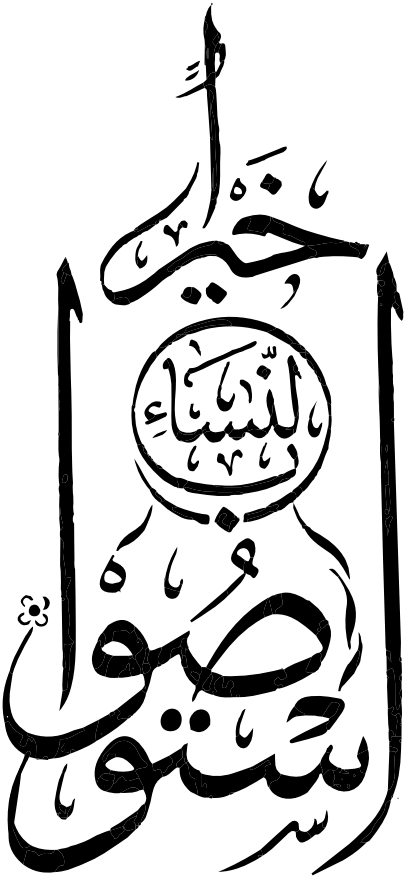
সমাজের দায়িত্ব

প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব প্রতিবেশী, আত্মীয় বা পরিচিত কোনও নারীর প্রতি নির্যাতন হতে দেখলে বা জানলে আপন সাধ্যমতো তার প্রতিবাদ করা এবং নির্যাতিতার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। নির্যাতিতার পাশে দাঁড়াতে হবে যেমন উপস্থিত নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্যে, তেমনি তার স্থায়ী নিরাপত্তার জন্যেও।

নির্যাতনের শিকার হয়ে যেসব নারী অসহায় অবস্থায় পড়ে গেছে, তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণও একটি জরুরি কাজ। যেমন গৃহহীনকে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া, অর্থহীনের অর্থের যোগান দেওয়া, স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, মানসিক সাপোর্ট দেওয়া ইত্যাদি। নির্যাতিতার পাশে দাঁড়ানোর একটি দিক হলো নির্যাতনকারীর উপর সামাজিকভাবে চাপ সৃষ্টি করা।

এর জন্য দরকার সহজলভ্য হেল্পলাইন। কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে যদি মানুষের চারিত্রিক সংশোধন করা সম্ভব হয়, তবে জুলুম আপনাআপনিই হ্রাস পেতে পারে। তাই কাউন্সেলিং সেবার ব্যাপক বিস্তার দরকার। সেই সঙ্গে প্রয়োজন আইনি সহায়তা দেওয়াও। এর জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পাশাপাশি সম্মিলিত উদ্যোগও দরকার। অনেক সময় একাকী চেষ্টা যেখানে বিফল হয়, সেখানে সম্মিলিত প্রচেষ্টা সুফল বয়ে আনতে পারে।

❁❁❁


استوصوا بالنساء خيرا